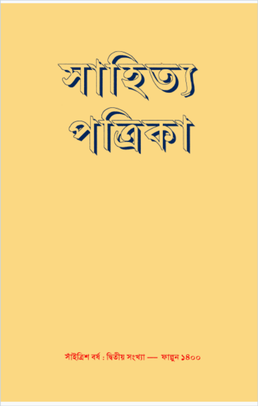

Vol. 37 | No. 2 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : বঙ্গীয় সমাজ-বৃত্তে নারী

Volume	37
Issue	2
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সফিকুন্নবী সামাদী
Published online	February 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i2.6
Pages	151-198
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : বঙ্গীয় সমাজ-বৃত্তে নারী

সফিকুন্নবী সামাদী

স্থানিক ও কালিক প্রেক্ষাপটেই কথাশিল্পী তাঁর রচনার পটভূমি তৈরী করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সমকালীন বঙ্গদেশের বাস্তবতা তাঁর কথাসাহিত্যে বিধৃত। শরৎচন্দ্রের সমকালীন সমাজ বলতে বুঝানো হয়েছে ১৯৭৬-১৯৩৮ পর্বের কথা।

শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালীন বাংলার সমাজকে অধ্যয়ন করেছিলেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অত্যন্ত নিকট থেকে। নরনারীর জীবন ও সম্পর্ককে প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করার যে তরঙ্গ বিশ শতকে আসে, তা শরৎচন্দ্রের শিল্পচেতনাকেও তরঙ্গিত করেছিল। উত্তরকালের রচনায় নারীর বন্ধন-অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব সচেতন রূপের যে পরিচয় তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছিল, তার নেপথ্যে বার্মার অভিজ্ঞতা ছিল সক্রিয়।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু 'নরনারীর সম্পর্ক'। অন্যান্য সমস্যা একে ঘিরেই আবর্তিত। নরনারীর সম্পর্ক চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরিচালিত হননি তিনি। ব্যক্তির হৃদয়কে তার ক্ষমতা-অক্ষমতা, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙক্ষা, মানসিক ক্ষুধা-যন্ত্রণা ইত্যাদির আলোকে অবলোকন করেছেন শরৎচন্দ্র।

গল্প ও উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের নানা সংকট এবং কতিপয় অমানবিক, অযৌক্তিক সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে বাঙালির সামনে নতুন ভাবনা উপস্থাপিত করেছেন শরৎচন্দ্র।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছিলেন 'লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭০:৫২২]। স্মর্তব্য,'কাল' স্বয়ংপ্রকাশ কোনো বস্তুগত সত্তা নয়। তার উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক ইত্যাদি কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'কাল' বলতে নিশ্চয় কোনো সময়ের এ-সমস্ত বৈশিষ্ট্যকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সাহিত্যস্রষ্টা যত বৃহৎ প্রতিভাই হো'ক না কেন—স্বদেশ ও স্বকালের উপস্থিতিকে একেবার অস্বীকার করতে পারেন না। আর কথাসাহিত্যে এ উপস্থিতি আরো স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনিবার্য। স্থানিক ও কালিক প্রেক্ষাপটেই কথাশিল্পী তাঁর রচনার পটভূমিটি গড়ে তোলেন। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সমকালীন বঙ্গদেশের বাস্তবতা তাঁর কথাসাহিত্যের সমস্ত শরীর জুড়ে রয়েছে। বলা যেতে পারে, তৎকালীন সমাজের নানান সমস্যা এবং সংস্কার-কুসংস্কার নিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের বিশাল জগত। তাই শরৎ-সাহিত্যে সামাজিক-বাস্তবতার মূল্যায়নের পূর্বে তাঁর সমসাময়িক সমাজের স্বরূপটি জেনে নেয়া আবশ্যক।

এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে কোনো দেশের কোনো কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা যত সহজে অনুধাবন করা যায়, সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপটি উন্মোচন করা তত সহজ নয়। একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর সন-তারিখযুক্ত বিন্যাস ও বিশ্লেষণে হয়ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিটিকে আয়ত্ত করা যায়। কতিপয় গাণিতিক হিসেব এবং পরিসংখ্যানগত তথ্যের বিচারে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটি বোধগম্য হওয়া অনেকটা সম্ভব। কিন্তু কেবল সন-তারিখ কিংবা গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য দিয়ে সমাজ-বাস্তবতাকে চেনা যায় না। এর মূল অনেক গভীরে; একে উপলব্ধি করতে সমাজদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবনে যেমন সমাজের বাহ্য-ঘটনাবলীকে লক্ষ করতে হয়, তেমনি অধ্যয়ন করতে হয় সমাজ-মানস ও সামাজিক মূল্যবোধকে। এ সকল কথা স্মরণে রেখেই আমরা শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজের স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা করব।

শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ সালে। উনিশ শতকের শেষ দিকেই তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় শুরু হয়েছে শৈশব-কৈশোর থেকে। "প্রথম জীবনের যে কালপর্বের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনশীল সত্তার উন্মেষ, মানসিক প্রস্তুতি, সেই কালপর্যায়কে, উনিশ শতকের সেই শেষ পঁচিশ বছরকে (১৮৭৬-১৯০০) অবশ্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির সমসাময়িক

কালের অঙ্গীভূত করতে হবে" শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক [গোবিকানাথ রায় চৌধুরী ১৯৭৭ : ৫১]। সমাজ বলতে, তাহলে আমরা ১৮৭৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কাল-পরিসরের সমাজকেই বুঝব। অভিজ্ঞতার সঙ্গে শ্রুতির সংযুক্তিতে এই কালসীমা আরও খানিকটা পিছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

উনিশ শতকে বাঙালির রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বিলেতের রেনেসাঁস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যেকার মৌল পার্থক্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট। বিলেতে 'রেনেসাঁস' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষে উৎসারিত, আর বাঙলার 'নবজাগৃতি' ধর্মীয় ও সামাজিক অন্ধ অনুশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত। শরৎচন্দ্রের জন্মের পূর্ব থেকেই রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজ তখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, কৌলীন্য প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন, নারী শিক্ষা আন্দোলন ইত্যাদির তরঙ্গে জঙ্গম হয়ে উঠেছে। নারী-স্বাধীনতা ও নারী জাগৃতির অভিযাত্রা উনিশ শতকের বাঙালি 'রেনেসাঁস-এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য এবং মধুসূদনের কাব্যসমূহ সেই অভিযাত্রার একটি উজ্জ্বল মাইলফলক।

কিন্তু বাঙালির এই রেনেসাঁস ছিল নগরকেন্দ্রিক, নগরেই সীমায়িত। এই নতুন উদ্দীপনা গ্রামসমাজে পৌঁছেছে সংবাদ হিসেবে মাত্র। নবজাগরণের ভাবতরঙ্গ বাংলার গ্রামীণ সমাজ-সংগঠনের স্থবিরতাকে আঘাত করতে পারে নি। পল্লীবাংলার মানুষ ও সমাজ তাদের যুগ যুগ লালিত অন্ধ বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার নিয়েই বিদ্যমান ছিল। পল্লীর বাঙালি সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের জগদ্দল পাথর ছিল স্থিত, শান্ত, নিরুপদ্রব।

বিশ শতকে বাঙালি সমাজে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তার আভাস দেখা দিতে থাকে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, নারীর জাগৃতি তত্ত্বের জগত থেকে বাস্তব সমাজে আসন গাড়তে শুরু করে। সমাজে মানবিক মূল্যবোধের জন্য আকৃতি বাড়তে থাকে। বিশ শতকের প্রথম থেকে বাংলা হয়ে উঠে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ 'রহিত-করণ', স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বাঙলার সমাজ বিশেষ করে যুবসমাজ একদিকে যেমন হয়েছিল উদ্দীপ্ত, অন্যদিকে তেমনি হতাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারী ইত্যাদি কারণে এই হতাশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অন্যদিকে রুশ বিপ্লবোত্তর মার্কসীয় দর্শনের বিশ্বব্যাপী প্রসার, দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন গড়ে ওঠা, স্বদেশে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা ইত্যাদি সমাজে যেমন আশার আলোর সঞ্চার করে তেমনি ফ্রয়েড, হ্যাভলক প্রমুখ দার্শনিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব হয়। নর-নারীর সম্পর্ক, প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত বিশ্বাসকে অস্বীকার করবার প্রবণতা এই সময় লক্ষ করা যায়। *কল্লোল, কালি-কলম* ও *প্রগতি* পত্রিকা প্রকাশিত হয় তখন এ সকল ভাবধারা নিয়ে।

কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক অব্দি বাংলার গ্রামসমাজ একেবারে স্থবির না থাকলেও তার পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর গতিতেই চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে এসবের হাওয়া লেগেছে গ্রামীণ সমাজ-কাঠামোর গায়ে।

শরৎচন্দ্রের শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের অধিকাংশ সময় কেটেছে বিহারের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত ভাগলপরে। বাংলার বাইরে এই অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্রের বাঙালিসমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছিল কিনা— এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। এক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ করতে হবে যে উনিশ শতকে বাঙালি-অধ্যুষিত ভাগলপুরকে বাংলার সমাজের একটি সম্প্রসারিত অংশ বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলার সমাজের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাগলপুর ছিল তৎকালীন বাংলার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

বিশ শতকের প্রথমেই (১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে) শরৎচন্দ্র কর্মোপলক্ষ্যে চলে যান বার্মায়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে আর স্থায়ী ভাবে ফিরে আসেন নি। কিন্তু এই প্রবাসকালেও স্বদেশ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতায় কোনো ছেদ পড়েনি। এর দু'টো কারণ রয়েছে।

প্রথমত স্বদেশ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এ প্রসঙ্গে দুটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। *পল্লীসমাজ* উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মার্কসবাদী সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ রায় বলেন [নীরেন্দ্রনাথ রায় ১৯৮৩ : ৪৮৭-৮৮] :

ক। Besides Bankim and Rabindranath had not what Sarat Babu has, an intimate and first-hand knowledge of the life of Bengal.

খ। He (Saratchandra) does not paint it (village-life) like a pastoral poet or like a man who knows the country through the windows of a railway carriage.

বস্তুত সমালোচকের এই বক্তব্য কেবলমাত্র *পল্লীসমাজ* এবং গ্রাম-বাংলা সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়। শরৎচন্দ্র সমস্ত বাংলাদেশকে, তাঁর সমসাময়িক বাংলার সমাজকে অধ্যয়ন করেছিলেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অত্যন্ত নিকটে থেকে।

দ্বিতীয়ত প্রবাস-জীবনেও স্বদেশ ও স্বদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ছিল তাঁর অখণ্ড যোগাযোগ। এই সময়ে বাংলা থেকে প্রকাশিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠক। ফলে সাম্প্রতিক সাহিত্য, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল। কোনো কোনো পত্রিকার ছাপাবার জন্য লেখাগুলো পর্যন্ত দেখে দিতেন তিনি। একটি পত্রিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব পর্যন্ত নিয়েছিলেন সুদূর প্রবাসে থেকেই। স্বদেশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগের আরও একটি মোক্ষম মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র। বর্মা-প্রবাসকালে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রগুলো পড়লে বোঝা যায় প্রবাসে অবস্থান করেও তিনি স্বদেশের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে কতটা জড়িত।

বাংলার সমাজ সম্পর্কে গভীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ও প্রবাসে অবস্থানকালে স্বদেশের সঙ্গে ব্যাপক, সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—এই দুইয়ের সুসংযুক্তি শরৎচন্দ্রকে বাংলার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি কোনো দিন। বিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলায় যে নতুন আলোক স্ফুরিত হয় তার জ্যোতি শরৎ-চেতনাকেও উজ্জ্বল করে তোলে। নর-নারীর জীবন ও সম্পর্ককে প্রচলিত রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণা থেকে না দেখে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করবার যে ব্যাপক জোয়ার আসে তার তরঙ্গ শরৎচন্দ্রকেও স্পর্শ করে, তাঁর শিল্প-চেতনাকেও তরঙ্গিত করে। অধিকন্তু শরৎচন্দ্রের এই বার্মা-যাত্রা এবং সেখানে অবস্থান তাঁর শিল্পমানসে দুটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে ; বলা যেতে পারে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শাণিত করেছে।

তৎকালীন বার্মার সামাজিক রীতি-নীতি, বিশেষত নারী স্বাধীনতা শরৎচন্দ্রের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। স্বদেশের সমাজের সঙ্গে এর বৈপরীত্য স্পষ্ট। সেখানে তিনি পরিচিত হয়েছেন এমন সব প্রবাসী বাঙালি নরনারীর সঙ্গে যারা আপন দেশে এককথায় 'সমাজচ্যুত'। নরনারীর সম্পর্কে নতুন অভিধায় দেখবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর বার্মাতেই, যার সূচনা ঘটেছিল স্বদেশে। 'শরৎচন্দ্রের উত্তরকালের রচনায় নারীর বন্ধন-অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব সচেতন রূপের যে পরিচয় ফুটে উঠেছিল তার নেপথ্যে ব্রহ্মদেশের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাতে সন্দেহ নেই' [গোপিকানাথ রায় চৌধুরী ১৯৭৭ : ৫৬]।

শৈশব থেকে বার্মা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্র স্বদেশে সঞ্চয় করেছিলেন তাকে একটু দূরবর্তী অবস্থান থেকে নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, পরিণত

বয়সের বুদ্ধি দিয়ে যাচাই বাছাই করবার, মেদহীন ও নিরেট করে তুলবার সুযোগ ঘটল বার্মা প্রবাসে।

শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে তৎকালীন বাঙালি সমাজের যে সমস্ত সমস্যা, বৈশিষ্ট্য ও প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন নিম্নলিখিতভাবে সেগুলোর বর্গীকরণ করা যেতে পারে :

এক। বিধবা সমস্যা ;

ক. বিধবার প্রণয়,
খ. বিধবার বিবাহ,
গ. বিধবার গৃহত্যাগ ('কুলত্যাগ'),

দুই। পতিতা সমস্যা ;

ক. কোনো নারীর পতিতা হবার ইতিবৃত্ত,
খ. পতিতার জীবন,
গ. পতিতার প্রেম এবং পরিণতি।

তিন। নরনারী সম্পর্ক/ নারীর প্রেম ;

ক. কুমারীর প্রেম,
খ. সধবার পরকীয়া প্রেম (দাম্পত্য জীবনে অসুখী),
গ. বিধবার প্রেম (পূর্বে উল্লিখিত),
ঘ. পতিতার প্রেম,
ঙ. আদর্শ দাম্পত্য প্রেম/ দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ,

চার। সতীত্ব/ সতীত্বের আদর্শ ;

ক. সধবার সতীত্ব,
খ. বিধবার সতীত্ব,
গ. পতিতা ও সতীত্ব,

পাঁচ। অন্যান্য সমাজিক সমস্যা ;

ক. কৌলিন্যপ্রথা,
খ. বাল্যবিবাহ,
গ. কুলীনের বহুবিবাহ,
ঘ. ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার ইত্যাদি।

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে নানান বন্ধনে যুক্ত। শরৎচন্দ্রের রচনায় এ সমস্ত সমস্যা একটি অপরটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে-বিযুক্ত করা যায় না এদের ; একটিকে স্বতন্ত্র বা প্রধান সমস্যা বলেও চিহ্নিত করা যায় না। সবকিছু মিলিয়ে গোটা সমসাময়িক সমাজই উঠে আসে শরৎ-সাহিত্য। কিন্তু তবু শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পে সামাজিক সমস্যার একটি কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। তার অভিনিবেশেরও রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থান। তা হল 'নরনারীর সম্পর্ক'। অন্যান্য সমস্যা একে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু নারীর প্রেম। নারীর হৃদয়, তার প্রেম, তার ব্যক্তিত্ব হল শরৎ-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। নরনারীর সম্পর্ক বা প্রেমের চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করেন নি। বরং প্রচলিত বিশ্বাসের গণ্ডীকে অতিক্রম করবার যে প্রবণতা উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে উদ্ভূত হয়েছিল, তার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি সমাজের অনুশাসনের চেয়ে, ব্যক্তির হৃদয়কেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন সংবেদনশীল শিল্পী হিসেবে।

অবশ্য এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র অগ্রপথিক নন। আরো দুই মহান কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যে এ পথে ভ্রমণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসদ্বয়ে বিধবা কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কন করেছেন। সমাজ-নিষিদ্ধ এই প্রেমে ব্যক্তি-হৃদয়ের নানান অলি-গলি, ভাবনা-বেদনা, কামনা-বিকার বর্ণিত হয়েছে শিল্পীর দক্ষতা ও সহানুভূতিতে। অবশ্য উপন্যাস দুটোর পরিসমাপ্তিতে কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর মৃত্যুতে নীতিবিদ্ধ বঙ্কিমের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন কোনো কোনো সমালোচক। স্বয়ং শরৎচন্দ্র রোহিণীর মৃত্যুকে *আর্টের* মৃত্যু বলেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাতে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের নিষ্ঠুর শাসনে প্রেমাকুল ব্যক্তি হৃদয়ের বেদনাদীর্ণ যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা মূল্যহীন বা মিথ্যা হয়ে যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *চোখের বালি* উপন্যাসে রহস্যজটিল নারীমনের ছবি এঁকেছেন। বিধবা বিনোদিনীর হৃদয়ের সমাজ অননুমোদিত কামনাবাসনা, 'নীতি-বিরুদ্ধ' আকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসের মূল উপস্থাপ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ অতৃপ্ত, প্রেমাকুলা বিনোদিনীর হৃদয়-রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন এবং তার 'আঁতের কথা' টেনে বের করেছেন। সেখানে তিনি সমাজের বিধি-বিধানের পরোয়া করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে সধবা শৈবালিনীর প্রেম, অপর পুরুষের প্রতি আসক্তি এবং তাকে পাবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এজন্য তিনি মুখ ফিরিয়েছেন ইতিহাসের দিকে, পশ্চাতে চলে গেছেন প্রায় শতবর্ষ। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও স্থির থেকেছেন তাঁর আপন কালে। গল্পের পটভূমি গড়ে তুলেছেন সমসাময়িক সমাজেরই ভিত্তির ওপর। 'নষ্টনীড়' গল্পে সধবা চারুলতার অতৃপ্তি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে উত্তোলন করেছেন দক্ষ ডুবুরীর মত। শীতল স্বামীর অচঞ্চল আচরণ, স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার অমিল ও অন্যান্য অনুষঙ্গ চারুলতাকে ধীরে ধীরে দেবরের প্রতি আসক্ত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচারক' গল্পের উপজীব্য করেছেন পতিতা সমস্যাকে। পতিতা ক্ষীরোদা এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হাকিম মোহিতমোহনের জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি একজন বিধবা নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা, 'কুলত্যাগ' এবং তার পতিতায় রূপান্তরিত হওয়ার চিত্রাঙ্কন করেছেন। এই গল্পে পতিতার নিন্দিত, ঘৃণিত, অমানবিক অনিশ্চিত জীবন থেকে মুক্তির গভীর ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে ক্ষীরোদা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পতিতাসমস্যার মূলে যে রয়েছে সমাজব্যবস্থা এবং উচ্চকোটির কতিপয় মানুষ তারও ইংগিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বিচারক' গল্পে। অবশ্য এরূপ গল্প রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর-পত্র' তো নারীর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক অনবদ্য দলিল।

শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষত কথাসাহিত্যের তন্নিষ্ঠ পাঠক। *চোখের বালি* এবং 'নষ্টনীড়' বহুবার পাঠ করবার কথা তিনি একাধিক স্থানে স্বীকার করেছেন। স্বীকার করেছেন যে ও দুটো রচনা পাঠ করে উৎসাহিত হয়েছিলেন তিনি, দীক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন রচনা দুটোর নিকট থেকে।

শরৎচন্দ্রের *চরিত্রহীন* উপন্যাসে কিরণময়ী দিবাকরের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল :

> এ কথা কোনদিন ভুলো না যে, কবি বিচারক নয়। নীতিশাস্ত্রের মতের সঙ্গে যদি তোমার মত বর্ণে বর্ণে নাও মেলে, তাতে লজ্জা পেয়ো না। আমি জানি, মানুষ পরের অক্ষমতা আর অপরাধ এক তুলাদণ্ডেই ওজন করে শাস্তি দেয়, কিন্তু তাদের বাটখারা ধার করে এনে তোমার কাজ চলবে না ।... কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর করে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই আর একটা কাজ [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬^{খ}: ১৪৬]।

কিরণময়ীর মুখে এ শরৎচন্দ্রেরই কথা, তাঁর সাহিত্যাদর্শ। একই বক্তব্য উচ্চারিত হয় শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে যখন নিজের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তিনি বলেন :

> আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলো গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু, বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,- এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতিপুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়১৩৮৭খ : ৫৩৯]।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন শরৎচন্দ্র। নিজের সাহিত্যকে নীতিশাস্ত্র না করে শিল্প করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যে শিল্পে ব্যক্তির অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া প্রচলিত সামাজিক সুনীতি-দুর্নীতির আদর্শে বিচার্য নয়। ব্যক্তির হৃদয়কে তার ক্ষমতা-অক্ষমতা, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানসিক ক্ষুধা-যন্ত্রণা ইত্যাদির আলোকে অবলোকন করতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির অন্তর্গত রক্তক্ষরণ এবং এর পরিণতি তাঁর কথাসাহিত্যে উজ্জ্বল রেখায় ও বিচিত্র রঙে অঙ্কিত হয়েছে।

একই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত দুজন লেখকের কথাসাহিত্যও স্বতন্ত্র হয়ে যায়। আসলে শিল্প কেবল বাস্তবতার ওপরই নির্ভর করে না, শিল্পীর বাস্তব দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি তার গুরুত্বও অপরিসীম। শিল্পে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যায় শিল্পীর জীবনদর্শন, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

কথাসাহিত্য ব্যতীত শরৎচন্দ্র ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নানা সমস্যা নিয়ে দুটো দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে 'নারীর মূল্য' ও 'সমাজ-ধর্মের মূল্য'। প্রবন্ধ দুটো বহু তথ্যে সমৃদ্ধ এবং অক্লান্ত শ্রমের ফসল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে প্রবেশ করবার পূর্বে প্রবন্ধ দুটোর ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া যেতে পারে।

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যগুলোকে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধে সমস্ত পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতাসমূহে নারীকে মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতাগুলো উত্থাপিত হয়েছে। ঐতিহাসিত তথ্য প্রদান করে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন যে মিসরীয় ও রোমান সভ্যতা ব্যতীত অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় নারীর জ্ঞান ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তো দুরের কথা সামান্য মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমেও নারীর অবস্থানকে বিচার করা

হয়নি। নারীকে মনে করা হতো পুরুষের সম্পত্তি স্বরূপ। *পুত্রার্থে ভার্যা* গ্রহণের রীতি ও মনোভাব প্রচলিত ছিল প্রায় সকল প্রাচীন সভ্যতায়। পুরাণ এবং শাস্ত্রকারগণ নারীর প্রতি আরও কঠোর। সে সমস্ত মতবাদ একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হল, নারী আত্মাহীন, সমস্ত পাপ ও কৃপণতার উৎস, এক কথায় নরকের দ্বার।

এই মনোভঙ্গির কারণ আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি পুরুষ এবং নারীকে দুটো শ্রেণী হিসেবে দেখেছেন এবং পরস্পরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। পুরুষ তার আপন স্বার্থেই নারীর জন্য বিধান তৈরী করে। তারপর এই বিধানই এক সময় ধর্মে পরিণত হয়। যে পুরুষ জীবদ্দশায় তার স্ত্রীকে ব্যবহার করেছেন সম্পত্তির মত, সে চায় তার মৃত্যুর পরও তার স্ত্রী তারই অধিকারভুক্ত থাক। তাই বিধবার বিবাহের বিধান নেই শাস্ত্রে। শুধু তাই নয়, বিধবার সহমরণের বিধান দেয়া হয়েছে। এই সহমরণ হত্যারই নামান্তর মাত্র।

উক্ত প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র 'জাতিভেদের অসংখ্য সংকীর্ণতা, বালিকা-বিবাহ, বিবাহ না দিলে জাত যাওয়া, বারো বছরের বিধবা মেয়েকে দেবী করার বাহাদুরী, পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সহিত এগারো বছরের মেয়ের বিবাহ' ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সেই শাস্ত্রকারদেরও সমালোচনা করেন যারা জোর করে স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে সামাজিক বিতর্কের মীমাংসা করেন। তাঁর মতে সামাজিক সমস্যাগুলোর মীমাংসার ভার তাদের ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিত, শিক্ষা যাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করেছে, মননকে যুক্তিনিষ্ঠ করেছে। মানবিক কারণ বা যুক্তি ত্যাগ করে যারা সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিধবার বিবাহে উদ্যোগী হন, অর্থাৎ যারা মনে করে বিধবার বিয়ে না দিলে কুলত্যাগের সংখ্যা বাড়বে তাদের বক্তব্যের ঘোর বিরোধিতা করেন শরৎচন্দ্র। তাঁর মতে বিধবার চেয়ে সধবাই কুল ত্যাগ করে বেশি এবং এই কুলত্যাগের কারণ কামনার তাড়না নয়, অর্থনীতি। যে পুরুষের প্ররোচনায় নারী কুলত্যাগ করে তার ক্ষমার বিধান থাকলেও কুলত্যাগিনীর কোনো ক্ষমা নেই। বরং পুরুষই তাকে আপন স্বার্থে করে তোলে পতিতা।

ভারতীয় সমাজে নারীর সতীত্ব রক্ষা একটি অপরিহার্য কর্ম। অথচ পুরুষের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। পুরুষ বহুবিবাহ করলেও নারীর সতীত্ব রক্ষার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে এই ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয় :

> Monogamy যাহা নারীর যথার্থ সম্মানের ঠাঁই, এবং যাহা একমাত্র নর-নারীর স্বাভাবিক বন্ধন, সে ধারণাই প্রায় এদেশে নাই। অথচ, সতীত্বের এত অপর্যাপ্ত রীতি-নীতি, এটা বজায় রাখিবার এত অদ্ভুত ফন্দি আর কোন দেশে কোনদিন উদ্ভাবিতও হয় নাই [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়১৩৮৬খ : ৫৯৭]।

শরৎচন্দ্র নারীর যথার্থ সম্মান রক্ষার জন্য পুরুষের এক বিবাহ রীতিতে বিশ্বাসী।

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন নারীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকারের প্রতি সমর্থন করেছেন। 'Divorce জিনিসটা বাঞ্ছনীয় নয়'- তা শরৎচন্দ্র স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে এই অধিকার থাকলে অন্তত এদেশীয় নারীদের চোখ বুজে পুরুষের সকল অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। প্রতিবাদ করবার খানিকটা হলেও সুযোগ থাকবে।

'সমাজ-ধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র অন্ধ শাস্ত্রকার যুক্তিবিবেচনাহীন সামাজিক রীতিনীতি ও কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন। 'আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কিরূপ ব্যক্তিগত ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়া উঠে'-তার স্বরূপ উন্মোচন করেন। এ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রের শ্লোক ও টীকা কণ্ঠস্থ না করে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলো ব্যাখার আহ্বান জানান। হিন্দু জাতির 'চাতুর্বর্ণ' বিষয়ক ঋগ্বেদের যে সূক্তের কথা পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে :

> ... হিন্দু জাতির প্রাণস্বরূপ এই সূক্তটিতে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি যেভাবে দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও খাঁটি সত্য জিনিস নয়-রূপক [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬[ক] : ৪১৭]।

এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন :

> 'নারীর মূল্য' আর লিখিব না, তবে এ সম্বন্ধে যেসব কথা বলিবার আছে, নানা প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে লিখিবার ইচ্ছা রহিল [গোপাল চন্দ্র রায় ১৯৮৬ : ৮৬]।

শরৎচন্দ্র অবশ্য 'নারীর মূল্য' সমাপ্ত করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আমরা 'সমাজ ধর্মের মূল্য' প্রবন্ধেও পেয়েছি। আর যেখানে এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করার আশা ব্যক্ত করেছিলেন, তা হলো কথাসাহিত্য। এই কথাসাহিত্যই বর্তমানে আমাদের প্রধান বিবেচ্য। আমরা প্রথমে গল্প থেকে শুরু করবো।

দুই

'পথ-নির্দেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র বিধবাবিবাহকে কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার-জাতিভেদ, কন্যার বিয়ে দিতে

না পারলে জাত যাওয়া, অসম বয়সের বিয়ে ইত্যাদি। নায়িকা হেম সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছে :

> গেলই বা মা। আমরা দুটি মায়ে-ঝিয়ে থাকব-দুঃখ করে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ক : ১১৭]।

সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাবাপন্ন এই নায়িকা গুণেন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে তারই ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার এই প্রতিবাদ কেবল মৌখিক নয়, সে গুণেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট আহার পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বে, সমস্যার সঙ্গে জড়িত নয় এমন ব্যক্তি সকল সময় সমাজের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু সেই সমস্যা যখন তার নিজের জীবনকেই গ্রাস করে তখনই সমাজশাসনের ভীষণ নিষ্ঠুর রূপটিকে চিনতে পারে সে। তখনই ব্যক্তি 'লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে মুখের সঙ্গে বুকের সঙ্গে এক করে দেখতে' সাহস পায়। একথা সত্য হয়েছে সুলোচনার জীবনে। আপন কন্যার বৈধব্য দশা প্রত্যক্ষ করেই বুঝতে পেরেছেন বৈধব্য কত বেদনাদায়ক। আপন কৃতকর্মের জন্য দুঃখ বোধ করেন। বিধবার অসহনীয় বেদনা পরিস্ফুটিত হয় তার সংলাপে :

> কি জানি, কোন্ পাষাণ বিধবার সাজ তৈরী করে গিয়েছিল, আজ আমি অভিসম্পাত করি, তাকে যেন আমার মত আঘাত বুক পেতে সইতে হয় [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ক : ১২৮]।

এখানেই সমাপ্ত হয়নি। সুলোচনা গুণেন্দ্রের সঙ্গে তার বিধবাকন্যার বিবাহের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করে যান। এর বিপরীত চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে 'পথ-নির্দেশ' গল্পে, হেম-র চরিত্রের ভেতর দিয়ে যা ফুটে উঠেছে তার স্বামীর মৃত্যুর পর। বহুযুগ ধরে পণ্ডিতেরা প্রচার করেছেন এসব কুসংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের। এই দীর্ঘ প্রচারণার ফলে এসব অস্ত্র ব্যক্তির মনকে বিদ্ধ করেছে অব্যর্থ ফলার মত। ব্যক্তির অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে এসব রীতি-নীতি, আচার-বিচার। তাই বিদ্রোহিনী হেমকেও ধর্মকর্ম আচার-নিষ্ঠার দিকে কোনো অলক্ষ শক্তি টেনে নিয়ে যায় সে নিজেও জানে না। তার মজ্জাগত সংস্কারের প্রভাবেই, যে স্বামীকে সে ভালবাসত না বলে নিজেই জানিয়েছে অসংকোচ ; তার মৃত্যুর পর ধর্মের নামে

বৈধব্য, বৈধব্যের আচারনিষ্ঠা হৈম-এর নিকট বড় সত্য হয়ে দেখা দেয়। গুণেন্দ্রের ভালবাসা তার চোখেও পড়ে না। হেমর সংলাপ লক্ষণীয় :

> বিধবার আবার বিয়ে কি গুণীদা ? আমি এত শিশু নই যে, ধর্মের ভান করলেই অধর্মের পথে পা বাড়িয়ে দেব [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬[ক] : ১৩৫]।

'আঁধারে-আলো' গল্পে শরৎচন্দ্র একজন পতিতাকে নায়িকা করেছেন যে 'হাবা-গাবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে' ভালবাসে। পতিতার (বাইজী) 'ছলা-কলা', চাতুর্য, পতিতালয়ের পরিবেশ এই গল্পে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। বিজলীর সংলাপ ও আচরণে, মদ্যপদের মত্ততায় বাইজীবাড়ীর পরিবেশ বাস্তবোচিত হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র পতিতালয়ের 'আঁধারে' প্রেমের 'আলো'র সন্ধান দিয়েছেন বাঈজী বিজলীর জীবনকে কেন্দ্র করে। বিজলী সত্যকে 'খেলাতে' গিয়ে স্বয়ং ভালবেসেছে। কিন্তু পতিতার ভালবাসার কোনো স্বীকৃতি দেয় না সমাজ। তার প্রেমানুভূতি ও স্বাভাবিক জীবনাকাঙ্ক্ষা কোনো পথ পায় না প্রস্ফুটিত হবার। তার ওপর আস্থা স্থাপন করে না কেউ, এমনকি প্রেমাস্পদও। বিজলীর অবস্থা বিশ্লেষণে এই সত্যই প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র। তিনি পতিতা বিজলীর অভ্যন্তরে নারীত্বের চিরন্তন মহিমাকে আবিষ্কার করেছেন। একদিকে নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে পতিতা-জীবনের গ্লানি ও অপরাধবোধ-এই দু'য়ের দ্বন্দ্বে বিজলীর হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে উপস্থাপন করেছেন তিনি।

'অরক্ষণীয়া' গল্পে বৈধব্যের যন্ত্রণা এবং কৌলিন্য প্রথা ও কন্যার বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলে জাত যাবার কুসংস্কার প্রকটিত হয়ে উঠেছে। এ গল্পে অবশ্য জ্ঞানদাকে সমাজ যতটা বিদ্ধ করেছে তার বেশী বিদ্ধ করেছে অতুলের অমানবিক নিষ্ঠুরতা। নরনারীর হৃদয়ের অভ্যন্তরেও খুব একটা বেশী প্রবেশ করেন নি শরৎচন্দ্র এখানে, বাহ্যিক ঘটনাবলীর দ্বারাই গড়ে তুলেছেন গল্পের অধিকাংশ। কিন্তু তবুও জ্ঞানদার কাতর প্রশ্ন সমাজধর্ম, তার রীতি-নীতি এমন কি অর্থনৈতিক বিন্যাসের মূলে আঘাত করে।

'আলো ও ছায়া' গল্পে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ বিরোধ বাহ্যঘটনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেনি। ব্যক্তির অভ্যন্তরে যে দুই বিরোধী সত্তার অবস্থান তাদেরই পারস্পরিক বিরোধের চিত্র অঙ্কন করেছেন শরৎচন্দ্র 'আলো ও ছায়া' গল্পে। ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার নিয়ত লড়াই চলেছে বিধবা সুরমার অভ্যন্তরে এবং খানিকটা যজ্ঞ দত্তেরও। সুরমার ক্ষেত্রে সমাজসত্তার মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে বাঙালির সনাতন সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কার।

বিধবা সুরমা সামাজিক সংস্কারবশেই আপন দুঃখের বিনিময়েও প্রেমাস্পদকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে চেয়েছে। যজ্ঞদত্তের বিবাহের ব্যবস্থা করে, বৌয়ের যত্ন করে, সঙ্গীর অভাব দূর করে নিজের আকাঙ্ক্ষা ও কষ্টের ওপর ছদ্মাবরণ তৈরী করতে চেয়েছে সে। কিন্তু তার ব্যথা ও যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি সুরমা। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় যজ্ঞদত্তের জন্য কনে দেখতে যাবার পর তার অবস্থা বর্ণনায়। যজ্ঞকে হারানোর আশঙ্কায় সুরমা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার এই যন্ত্রণা-কাতরতা আরও স্পষ্ট হয় যজ্ঞদত্তের কনে দেখে আসবার পর অর্থহীন অসংলগ্ন আচরণে। কনে পছন্দ হয়েছে কিনা একথা সে বার বার জিজ্ঞাসা করে। কারণ, 'এমনটি সে মোটেই আশা করে না যে, এত অল্পে পছন্দ হইবে, এবং এত শীঘ্র সম্বন্ধ পাকা হইবে।'

এদিকে যজ্ঞ সুরমার যন্ত্রণার কথা ভেবে বিবাহে অসম্মতি জানায়। আবার তারই ইচ্ছার প্রাবল্যে বাধ্য হয় বিবাহে। কিন্তু সুরমার স্বেচ্ছাসৃষ্ট দূরত্ব যজ্ঞকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। বধূকে রেখে আসে বর্ধমানে পিসির কাছে। এর জন্য তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। পিসির মৃত্যুর পর বধূর সারল্যে যজ্ঞ তার মিথ্যাচারের জন্য যন্ত্রণা বোধ করে। কিন্তু তবু যজ্ঞ তা প্রকাশ করতে পারে না। কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সুরমার প্রতি সমাজনিষিদ্ধ প্রেমানুভূতি।

শেষ পর্যন্ত সুরমার অভ্যন্তরের সমাজ সত্তাই জয়ী হয়। এই জয়কে অবশ্য ত্বরান্বিত করে বধূর প্রতি যজ্ঞের নির্দয় অবহেলা, মিথ্যাচার ইত্যাদি বাহ্য ঘটনার আঘাত। নিজের প্রতি তার ধিক্কার আসে ; 'মহানপাতকী' বলেই আখ্যায়িত করে। বধূর করুণ দশার জন্য নিজেকেই তার দায়ী বলে মনে হয়। যজ্ঞকে সে বলে :

> ... কি ভেবে বিয়ে করেছিলে ? কি ভেবে ত্যাগ করে আছ ? আমার জন্য ? আমার মুখ চেয়ে এই প্রতারণা করে আসচ ? [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়১৩৮৬ক : ২২০]।

এবং পরক্ষণেই যজ্ঞের বাড়ী ত্যাগ করে যাবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে।

'মন্দির' গল্পে ধর্মীয় সংস্কার সমস্ত জীবন অপর্ণাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। পিতৃকুলের মন্দিরই তার হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছিল। স্বামীকেও সে ভালবাসতে পারে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর অপর্ণা মন্দিরের সেবায় প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে আরও গৌরবান্বিত বোধ করে। দেবতার আহ্বানে সে ফিরে এসেছ, এই বিশ্বাস তার হৃদয়ে দৃঢ়মূল হয়। তাই 'যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত

উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তাহার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল।' শক্তিনাথকে সে সত্যি ভালবেসেছিল। তার এই ভালবাসা আজন্ম লালিত সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করেছে, পরাস্তও হয়েছে। শক্তিনাথের উপহার অপর্ণা গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য এতে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। অপর্ণার অন্তর্গত রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে শক্তিনাথের মৃত্যুসংবাদে। নিজেকেই সে দায়ী করেছে শক্তিনাথের মৃত্যুর জন্য। তারই পাপে মৃত্যু ঘটেছে এই তার বিশ্বাস। কিন্তু তবু শক্তিনাথের উপহার সে গ্রহণ করতে পারেনি। নিবেদন করেছে দেবতার পায়ে।

'বোঝা' গল্পে ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সত্যেন্দ্রের প্রথম স্ত্রীর বেদনাঘন স্মৃতি এবং সত্যেন্দ্র ও নলিনীর অভিমান। কিন্তু সমাজ এ গল্পেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার গোপন পক্ষ বিস্তার করে আছে। নলিনীও অভিমান করেছে শেষের দিকে, খানিকটা হলেও। কিন্তু তার অভিমান বেশীদূর এগুতে পারে নি, কারণ সে নারী। কিন্তু সত্যেন্দ্রের অভিমান তৃতীয় বিবাহ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কারণ পুরুষ-শাসিত সমাজে এ অধিকার তার জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শরৎচন্দ্র গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে বলেন :

> তোমরা যুবা; সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন ; [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ক : ২৪৪]

এই 'যুবা' শব্দটির পরিবর্তে 'পুরুষ' শব্দটি ব্যবহার করলে খুব বেশী অসঙ্গত হয় না।

বিবাহের লগ্নে সুরেশের অমানবিকভাবে পলায়ন, চন্দ্রনাথের পিতৃ উইল জাল করা (গল্পকারের ইংগিত সেরকমই) ইত্যাদির পাশাপাশি সামাজিক অনুশাসনও 'অনুপমার প্রেম' গল্পের ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করে। এই অনুশাসনের কারণেই জগবন্ধু বাবু জাত যাবার ভয়ে কন্যা অনুপমাকে লগ্ন থাকতে তুলে দেয় বৃদ্ধ যক্ষ্মারোগী রামদুলালের হাতে। বিধবা অনুপমা চন্দ্রনাথের দুর্ব্যবহারে, মিথ্যা কলঙ্কের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে যায়। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে ললিতমোহনের ভালবাসার কথা-যাকে সে একদিন অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল, এমনকি কারাগারে প্রেরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অনুপমার মনে ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা জন্মে আবার ভালবাসবার, বা ভালবাসা পাবার। কিন্তু সংস্কার ও কলঙ্কের লজ্জা তাকে

এগুতে দেয় না। ললিতমোহন অবশ্য সমস্ত সংস্কার অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করে, গ্রহণ করে। এছাড়াও এ গল্পের পাত্র-পাত্রীর কিছু কিছু সংলাপে সামাজিক সংস্কারকে, প্রচলিত বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করবার প্রবণতা লক্ষ্য করবার মত। যেমন ;

ক. বিবাহ সম্পর্কে অনুপমার উক্তি-

> যাকে তাকে গছিয়ে দেওয়ার নামই বিবাহ নয়! মনের মিল না হলে বিবাহ করাই ভুল [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ১৩৮৬ক : ২৪৭]

খ. বিধবা বিবাহ সম্পর্কে জগবন্ধু বাবুর উক্তি-

> অনেক ভেবে দেখলুম, দু'বার বিবাহ দিলেই ধর্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে এবিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন ক... খুন করলেই ধর্মহানির সম্ভাবনা [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ১৩৮৬ক : ২৫৫]

'স্বামী' গল্পে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সামাজিক অনুশাসন। তবে এ ক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধটা বাহ্যিক কোনো ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। ব্যক্তির অভ্যন্তরের সামাজিক সংস্কার তার প্রেমাকাঙ্ক্ষার সমালোচনা করেছে, ধিক্কার দিয়েছে। আর এই আকাঙ্ক্ষা এবং সমালোচনা ও ধিক্কার সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়নি। ঘটনা ঘটে যাবার পর নায়িকা তার জীবনের কাহিনী বর্ণনা করবার সময় সমাজ-শাসন নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিজেকে ধিকৃত করেছে, এমন কি পতিতা বলেও আখ্যায়িত করেছে।

সৌদামিনী নরেনের প্রতি তার প্রেমাকর্ষণ বিকাশের স্তরগুলোকে বর্ণনা করেছে। দুজনের বিবাহ সম্ভব হয়নি অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণে। পরিকল্পনা করেও পালিয়ে যেতে পারে নি তারা, নরেন আকস্মিকভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। স্বামীর বাড়িতে স্বামীর প্রতি এক ধরনের মানসিক আকর্ষণ অনুভব করেছিল সৌদামিনী, তার উদারতা এবং তার প্রতি অন্যদের অন্যায় আচরণ ও অবহেলার কারণে। কিন্তু শাশুড়ীর গঞ্জনা, স্বামী ঘনশ্যামের শীতলতা এবং মাতুলালয়ের ঘর পোড়া নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তখনই আসে নরেনের আহ্বান (সৌদামিনীর বর্ণনাভঙ্গি থেকে একে চক্রান্ত বললেও ভুল হয় না।) স্বামীগৃহ ত্যাগ করে সৌদামিনী উপলব্ধি করত পারে তার অভ্যন্তরে হিন্দু রমণীর

পতি-সংস্কার কতটা প্রবল। অবশ্য সে স্বামীগৃহে ফিরে আসতে পারত না তার উদার ক্ষমাশীল স্বামী তাকে ফিরিয়ে না আনলে।

'বিলাসী' গল্পে সমাজের নিষ্ঠুর আচরণ দুটি নরনারীর জীবনকে দুঃখজর্জর করে তুলেছে, অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কায়স্থ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হলে সাপুড়ে কন্যা বিলাসী তাকে সেবা করে সুস্থ করে তোলে। মৃত্যুঞ্জয় তাকে ভালবেসেছিল এবং তার ভালবাসা সফল করে তুলেছে বিলাসীকে 'নিকে' করে। অবশ্য বিবাহটাই বড় অপরাধ নয়। সমাজের নিকট বড়পাপ হল অন্নগ্রহণ, যা সমাজের ভাষায় 'অন্ন-পাপ'।। সমাজ কর্তারা চড়াও হয়েছে বিলাসীর ওপর। সে কিন্তু এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। বলেছে 'বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো।' কিন্তু সমাজ সে বিবাহ মানে না। তাই দূর করে দেয় তাকে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী থেকে। অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সারারাত অভুক্ত থাকবার দোহাইও তাদের হৃদয়ে সামান্য মমতার সঞ্চার করে না। মৃত্যুঞ্জয় সমাজের এই বিধান মেনে নেয়নি। বরং সমাজকেই সে ত্যাগ করেছে প্রেমের মর্যাদা দিতে। সেই প্রেমের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সামজের অন্ধ চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলেন :

> বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ে মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ক : ২৯১]

বস্তুত প্রেমের গৌরবে ক্ষুদ্র ব্যক্তির অভ্যন্তরে যে মহত্ত্ব, সাধারণের ভেতরে যে অসাধারণ জ্যোতি তা আবিষ্কার করা এবং এই প্রেমের কারণেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে নিয়ত লড়াই তা প্রকাশ করাই শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, 'সাধু গৃহস্থ' এবং 'সাধ্বী গৃহিণী'দের অক্ষয় সতীলোকপ্রাপ্তি সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ মাত্র। আগাগোঁড়া গল্পটির মেজাজ ও বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ করলেই এ উক্তি প্রমাণিত হয়। পুরো গল্পটিতে লেখক সামাজিক কুসংস্কারগুলোর সমালোচনা করেছেন। গল্পে প্রকাশিত তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ লক্ষণীয়।

তিন

বড় দিদি উপন্যাসে বিধবা মাধবীর প্রেমানুভূতির উন্মেষ দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে। আত্মভোলা সুরেন্দ্রের ওপর তা 'একটা অজ্ঞা ও করুণার চক্ষু'

পতনের মধ্য দিয়েই এর সূত্রপাত। ক্রমশ সুরেন্দ্র তার বালকসুলভ সারল্য ও আত্মনির্ভর-শূন্যতার অসহায়ত্ব দ্বারা মাধবীর স্নেহকরুণ হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে এবং তার 'অর্ধেক সময় কাড়িয়া লইয়াছে'। মাধবীর প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে সুরেন্দ্রের গৃহত্যাগের পর তার হৃদয়বেদনা, উদ্বিগ্ন অনুসন্ধান-তৎপরতা এবং অন্নজল ত্যাগের মধ্য দিয়ে।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির লড়াইটা বাহ্যিক ঘটনানির্ভর নয় *বড়দিদি* উপন্যাসে। মাধবীর বিতর্কটা হয়েছে মনোরমার সঙ্গে।। কখনো পত্র-মাধ্যমে, কখনো বা মুখোমুখি। মনোরমাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি না বলে, মাধবীরই আর একটি সত্তা বললে অত্যুক্তি বা প্রমাদ হয় না। তাকে বলা যেতে পারে মাধবীর সামাজিক সত্তা। মাধবী জানে,সমাজ বিধবার ভালবাসা স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু তবু প্রেমকে সে অস্বীকার করতে পারে না। সে দুর্বল, তাই কান্নাই তার সম্বল। একথা সত্য যে মনোরমাও কাঁদে মাধবীর জন্য। কিন্তু সে সংস্কারাচ্ছন্ন অমানবিক সামাজিক বিধানেরই ভক্ত, রক্ষক বললেও চলে। সে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে :

—মাধবী পোড়ামুখী—বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে ! [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৩৬৯]

যুগ যুগ ধরে লালিত সংস্কারের ফলে ব্যক্তির মনে সামাজিক রীতিনীতির প্রতি যে স্থবির বিশ্বাস দানা বাধে, এ তারই ফল। এ সংসার মাধবীর অভ্যন্তরেও ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে মনোরমা সমাজেরই নিষ্ঠ প্রতিনিধি।

রাজলক্ষ্মীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের মধ্যে বিচিত্র টানা-পোড়েন এবং তার আত্মদহনই *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। উপন্যাসটি বিশাল পটভূমিতে চারটি পর্বে রচিত। শ্রীকান্ত তার জীবন পরিক্রমায় একটি বৃত্ত সৃষ্টি করেছে, যে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাজলক্ষ্মী। সেই বৃত্তের পরিধির ওপর, (শ্রীকান্ত আপন জীবন পথে নানান গঠনার সম্মুখীন হয়েছো), বিচিত্র নরনারীরা কখনো এ উপন্যাসে উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছে, আবার কখনোবা কেবলমাত্র প্রসঙ্গ হিসেবে রয়ে গেছে। কিন্তু তবু শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমই এ উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য।

রাজলক্ষ্মী বিধবা এবং পতিতা (বাইজী)। তবে এই বৈধব্য এবং পতিতাবৃত্তির মূলে রয়েছে সনাতন হিন্দু সামজের নিষ্ঠুর বিধি-নিষেধ। দরিদ্র মাতুল সত্তর টাকা

যৌতুক দিয়ে দুই সহোদরাকে একই কুলীন ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করেছিল জাত বাঁচানোর জন্য। দুজনের মধ্যে বড় বোন সুরলক্ষ্মী মরেছিল বাল্যকালেই। আর রাজলক্ষ্মী হয়েছে পাটনার 'মশহুর' পিয়ারী বাঈ। রাজলক্ষ্মীর পতিতা হবার পশ্চাতে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণ খানিকটা উঁকি মারে, তার মায়ের কন্যা বিক্রয় করবার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে ছবি বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হয়নি। শরৎচন্দ্র বোধকরি সমস্যাকে সেই দিকে নিয়ে যেতেই চাননি। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। রাজলক্ষ্মী বিধবা অবস্থায় পতিতা জীবনে পদার্পণ করলেও প্রাপ্তবয়সে করেনি, করেছিল শৈশবে। এবং তাও স্বেচ্ছায় নয়, বলা চলে অন্যদের চক্রান্তে। কিন্তু তবু রাজলক্ষ্মী সমস্ত জীবন পতিতা-জীবনের পাপবোধ, অপরাধবোধ, দুঃসহ ক্লেদ-গ্লানি বয়ে বেড়িয়েছে। এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি-আকুল হয়েছে তার হৃদয়। 'অজ্ঞানে অভাবে পড়ে' একদিন যে জীবনে পা দিয়েছিল সে জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। কিন্তু সমাজ পুরুষের যত গুরুতর অপরাধই ক্ষমা করুক না কেন, নারীর সামান্যতম পদস্খলনও ভুলতে পারে না। রাজলক্ষ্মীর প্রশ্ন পুরুষ-শাসিত সমাজের ভিত্তিটাকে নাড়া দিয়ে যায় :

> পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা কর; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৮৫]।

রাজলক্ষ্মী শৈশবে বরণ করেছিল শ্রীকান্তকে বৈঁচি ফলের মালা দিয়ে। পতিতা জীবনের অসহনীয় মানসিক যাতনার মাঝেও ভুলতে পারে নি তাকে কোনো দিন। জীবনে আর কাউকে কোনো দিন ভালবাসতেও পারে নি। হৃদয়ের সমস্ত কামনা দিয়ে সে শ্রীকান্তকে চায়। কিন্তু তার ভালবাসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তার মাতৃত্ব-সংস্কার। রাজলক্ষ্মী অনুভব করে, সে কেবল নারী নয়, মাতাও বটে। তার এই মাতৃত্ব দুজনের ভালবাসার মাঝখানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করে। শ্রীকান্তের ভাষায় :

> আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এতদিন চলুক না, স্নেহ যত মাধুর্য ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৭৫]।

মাতৃত্ব সংস্কার এবং প্রেমের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়েছে রাজলক্ষ্মী-হৃদয়। এক সময় অবশ্য রাজলক্ষ্মী মাতৃত্বের চেয়ে নিজের প্রেমকেই বড় করে পেয়েছে আপন হৃদরে। সকল দ্বিধা গেছে ঘুচে। কিন্তু তাকে গ্রাস করেছে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা রাজলক্ষ্মীকে উম্মাদ করেছে। সকল কামনা গলাটিপে হত্যা করতে চেয়েছে সে। শ্রীকান্ত অবহেলা করেছে, সরিয়ে দিয়েছে দূরে বারবার। আপন আঘাতে কেবল রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ই বেদনাদীর্ণ হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর নিজের ভাষায় :

> ... ভাবলুম, আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরী হলো বলে। এক আপদ তুমি—সেত বিদায় হলো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতেই থামেনা [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৩১৩]।

রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল যে হাজার বছরের সামাজিক সংস্কার তা কখনো প্রকাশিত হয়েছে মাতৃত্ব রূপে, কখনো ধর্ম ও ধর্মীয় আচার রূপে। আর তার প্রেমাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেঁধেছে এর বিরোধ। অবশেষে অবশ্য রাজলক্ষ্মীর প্রেমই জয়ী হয়েছে। সে পৌঁছে গেছে এমন এক অনুভবের জগতে যেখানে প্রেম কেবল সত্য পুর্ণ্য; ধর্ম, দেবতা সবই তুচ্ছ :

> ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুর্ণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম তবে থাক গে আমার ধর্মচর্চা-জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায় ? [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৩১৩]।

এই সত্য বুকে নিয়ে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করে।

এই উপন্যাসে শ্রীকান্তও দ্বিধামুক্ত নয়। ভবঘুরে শ্রীকান্তের অভ্যন্তরেও নিয়ত যুদ্ধ চলেছে প্রেমাকর্ষণ এবং সমাজানুগত্যের। তার ক্ষেত্রে, বরং বলা যায়, লড়াইটা আরও জোরালো, আরেকটু স্পষ্ট। শ্রীকান্তের হৃদয়ের যে দ্বন্দ্ব তার পক্ষ দুটো নয়, তিনটে। সামাজিক সংস্কার থেকে উৎসারিত হলেও অন্নদা দিদির স্মৃতি ও আদর্শ তার মনে স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে বিরাজ করছিল। শৈশবে সে প্রত্যক্ষ করেছিল অন্নদা দিদিকে। সেই থেকে তার মনে সৌন্দর্য, সতীত্ব ও ব্যক্তিত্বের একটি আদর্শ গড়ে উঠেছিল। নিজের প্রেমিকা হিসেবে এমনি আদর্শ প্রতিমাই প্রত্যাশা করত সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল :

জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এম্‌নি মৃদু কথা, ঠোঁটে এম্‌নি মধুর হাসি, ললাটে এমনি অপরূপ আভা, চোখে এমনি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এমনি সতী, এমনি সাধ্বী হয়।
[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৫৫]

এই ছবি সমস্ত জীবন তার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে এই আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করতে চেয়েছে। রাজলক্ষ্মীর প্রতি প্রথম আকর্ষণ অনুভব করবার পর তার মনে দানা বেঁধে ওঠে আত্মধিক্কার। পাঠকের ছদ্মাবরণে নিজেই তিরস্কৃত করে নিজেকে। অন্নদার তুলনায় রাজলক্ষ্মীকে 'ঝুটা' বলেই মনে হয় তার। কুমার সাহেবের তাবু থেকে ফিরে যাবার সময় গাড়ীর ওপরে রাজলক্ষ্মী সম্পর্কে শ্রীকান্তের মনোভঙ্গি লক্ষণীয় :

হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৬২]।

শ্রীকান্তের দ্বিধা এখানেও। রাজলক্ষ্মীর অভ্যন্তরে অগ্নিপিণ্ডের পূর্বাভাস লক্ষ করলেও তার 'পতিতা' নামটি ঘোচেনি। বলাবাহুল্য, এই অগ্নিপিণ্ড নিশ্চয় অন্নদা দিদির সেই 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি' যার সাক্ষাৎ লাভ করেছিল শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর অভ্যন্তরে কাশীর বাড়ী থেকে বিদায় নেবার সময়। এখানে অন্নদার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর সাদৃশ্য খুঁজে পায় সে। কিন্তু তার দ্বিধা আরও স্পষ্ট রূপ লাভ করে যখন সে ভাবে :

সে (রাজলক্ষ্মী) যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৮৫]।

একদিন শ্রীকান্ত এই ভালমন্দের মীমাংসা করে। লোকভয় ও সামাজিক অনুশাসনই তার কাছে বড় হয়। রাজলক্ষ্মীকে সে প্রত্যাখ্যান করে। শ্রীকান্তকে তখন সমাজানুগত মানুষ বলেই মনে হয়। তার এই প্রত্যাখ্যান যে কেবল সমাজ-ভীতির

কারণে তাই নয়; বরং ধর্মও এখানে ক্রিয়াশীল। সমাজের দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত ভগবানের দৃষ্টিরই ছায়া প্রত্যক্ষ করে। প্রেমের চেয়ে বড় হয় তার কাছে সামাজিক অবস্থান। শ্রীকান্তের সংলাপ লক্ষণীয় :

> ... কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হয়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না ? ....

এবং

> ... কিন্তু তার (ভগবানের) চক্ষু ত সর্বদা দেখা যায় না! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী!
> [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ১৫৫]

রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত আবার পায় দেশের বাড়িতে রোগশয্যায়। তখন তাকে অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী বলেই মনে হয়। সেখানে রাজলক্ষ্মীকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভেবেছিল শ্রীকান্ত, সত্যে তার প্রয়োজন নেই মিথ্যাকেই মাথায় তুলে নেবে। মিথ্যাকে মাথায় তুলে নেবার সাহস থাকলেও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করবার সাহস তার নেই। রাজলক্ষ্মীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেও, সত্যি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবার সাহস নেই। এর মূলে রয়েছে সামাজিক সংস্কার ও ভীতি। 'পিয়ারী বাইজী' রাজলক্ষ্মীকে পরাজিত করতে পারেনি, একথা জেনেও শ্রীকান্তের হৃদয়ের দ্বিধা শেষ হয়নি। এই দ্বিধা এক সময় গ্লানিতে পরিণত হয়, শ্রীকান্ত আবিষ্কার করে যে রাজলক্ষ্মীকে সে ভালবাসে না। তার ভাবনাস্রোত লক্ষণীয়:

> সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে; কোথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ১৬৯]।

শ্রীকান্তের এই অনুভূতি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী নয় । কিন্তু তবু এই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, গ্লানি ও আত্ম-বিড়ম্বনা সমস্ত জীবন তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, স্থির হতে দেয়নি, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেয়নি। চতুর্থ পর্বের সূচনায় শ্রীকান্ত বলেছে :

> এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মতো। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ২৫১]।

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের এই ত্রিশঙ্কুদশার জন্য রাজলক্ষ্মী যতটা দায়ী, শ্রীকান্ত তার চেয়ে কোনো অংশে কম দায়ী নয়। আর দু'জনেরই অভ্যন্তরে গোপনে কাজ করেছে দুর্লক্ষ সামাজিক সংস্কার। সংস্কার তাদেরকে কাছে আসতে দেয়নি। প্রেম তাদের দূরেও যেতে দেয়নি। তাদের এই টানাপোড়েনের রক্তক্ষরণই গড়ে তুলেছে *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের শিল্প-প্রতিমা।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে অন্নদা-বিষয়ক ঘটনাবলী একটি স্বতন্ত্র উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছে। স্বামীর জন্য অন্নদা পিতা-মাতা সমাজ-সংসার সকল কিছু ত্যাগ করেছে। অথচ এই স্বামীই তার অগ্রজাকে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিল। যে স্বামীর প্রকাশ্যে লোকালয়ে বাস করবার অধিকার বা সাহস কোনোটাই নেই, সাপুড়ে বেশধারী সেই স্বামীর হাত ধরে ঘর ছেড়েছে অন্নদা। সে স্বামীর দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে বরণ করে নিয়ে সমাজের চোখে, সংসারের বিচারে কুলত্যাগিনী, পতিতা। কিন্তু সে সমাজের এই অপবাদের পরোয়া করে না। অবশ্য অন্নদা সমাজের এক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে আরেকটি সনাতন সংস্কারকেই আঁকড়ে ধরেছে।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে অভয়ার উপকাহিনী নারীর অবহেলিত ও সম্মানহীন সামাজিক অবস্থানের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অভয়া তার নিখোঁজ স্বামীর অনুসন্ধানে আসে বার্মায়। স্বামীর নিকট সামান্য আশ্রয়ের জন্য সে সবকিছু করতেই সম্মত। এমন কি সতীনের সঙ্গে ঘর করতেও আপত্তি নেই তার। কিন্তু স্বামীর পুণপুণ অমানবিক আচরণে ব্যক্তিত্বময়ী অভয়ার হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সমাজ বিধানগুলোকে আর তার অলংঙঘনীয়, অমোঘ বলে মনে হয় না। নারীর অধিকারবিহীন যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের সংস্কার, তার বিরুদ্ধে অভয়ার বিদ্রোহ স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়। মন্ত্রের অর্থহীন আবৃত্তির মাধ্যমে যে বন্ধন গড়ে দেয়া হয়, পুরুষ তার সুযোগ গ্রহণ করে সমস্ত জীবন। আর নারীকে আমৃত্যু এই বন্ধন বয়ে বেড়াতে হয়, নারীত্ব আর সতীত্বের নামে। অভয়া এই অচলায়তন সমাজের স্থবির, অন্ধ, হৃদয়হীন বিধি-নীতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। হৃদয়হীন স্বামীর একান্ত অনুগত অধিকারহীন, আনন্দহীন জীবনযাপনই কি নারীত্ব ও সতীত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় ? তা নইলে কি নারী জীবন ব্যর্থ ? অভয়ার এই প্রশ্নে সনাতন হিন্দু সমাজের

ভিত্তি পর্যন্ত কম্পিত হয়। অবশেষে অভয়া তার প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান পেয়েছে আপন হৃদয়ে। সে জেনেছে যে, যে সংসারে বিশ্বাস নেই, প্রেম নেই, মমতা নেই, মন্ত্রের বন্ধন হলেও সে বন্ধন আঁকড়ে থাকা 'গণিকা'র জীবনেরই নামান্তর মাত্র। রোহিনীর ভালবাসা তাকে এই সত্যে উপনীত হতে সহায়তা করেছে। রোহিনীর প্রেমকেই সে স্বীকৃতি দিয়েছে, সতীত্বের মোহে প্রেমের অমর্যাদা করেনি সে। শ্রীকান্তকে অভয়া বলেছে :

> ... এমন লোকের (রোহিনীর) সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু। [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ১২৭]।

কিন্তু এর জন্য অভয়ার মনে কোনো পাপবোধ নেই, তাদের ভালবাসায় কোনো পাপ আছে বলে মনে করে না সে। সমাজর ভয়ও নেই, নেই ভবিষ্যতের সন্তানদের কথা ভেবে কোনো লজ্জা। বরং রয়েছে সন্তানদের বড় করে গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সংকল্প :

> ... আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসেবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ১২৭] ।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে কমললতার কাহিনীতে অপরিতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং তার ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই কাহিনীর পটভূমিতে রয়েছে বিধাতার স্বাভাবিক জীবন এবং সংসারাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। কমল বয়ে বেড়াচ্ছে প্রণয়ী মন্মথের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা এবং নিষ্পাপ তরুণ যতীনের আত্মহত্যার দায় ও অপরাধবোধের দুঃসহ যন্ত্রণা। বৈষ্ণব রসবিলাসে তার মন ভালবাসার রস-পরিতৃপ্তি খুজে পায় নি। তার মুক্তি পাগল মন আশ্রমের সকল বন্ধন ছিন্ন করে পালাতে চেয়েছে। শ্রীকান্তের ভাষায় :

> রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,-দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না- [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ২৮৫]।

কমলের প্রবৃত্তি, সংরক্ত প্রেম প্রতি মুহূর্তে অবলম্বন খুঁজে মরেছে। শ্রীকান্তকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছে। জানিয়েছে তাকে বেরিয়ে পড়বার আহবান। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তবুও নিজেকে সুখী বলেই ঘোষণা করেছে সে। সহস্র বঞ্চনার মাঝে এই আত্মপ্রবঞ্চনাটুকু তার বেদনাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। অবশ্য একদিন সে মুক্তি পেয়েছে। তবে অপবাদ নিয়ে মুসলিম গহরকে মুমূর্ষু অবস্থায় সেবা করবার কারণে। একদিন যে বৈষ্ণব সমাজকে আশ্রয় করে সে ভালবাসার পূর্ণতা পেতে চেয়েছিল, সেই বৈষ্ণব সমাজই তাকে আরেকদিন 'অশুচি' অপবাদ দিযে সমাজচ্যুত করেছে।

দেবদাস উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পতিতা চন্দ্রমুখীকে প্রেমের আলোকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। পতিতার অভ্যন্তরেও যে একজনকে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন তিনি। দেবদাসকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিল চন্দ্রমুখী। কিন্তু তার ধন-সম্পদের লোভে নয়। চন্দ্রমুখীর ভাষায়

> যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেইদিন থেকেই তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা জানতাম! কিন্তু ধনের আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৭[ক] : ১৪০]।

চন্দ্রমুখীর অভ্যন্তরের যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা পথ খুঁজে ফিরছিল তাই আকৃষ্ট হয়েছে দেবদাসের 'তেজ' এর প্রতি। দেবদাসের সংস্পর্শে তার নারীত্ব জেগে উঠেছে। তাকে আশ্রয় করেই চন্দ্রমুখী জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে চেয়েছে। সে ঘৃণিত দেহ-ব্যবসায় ত্যাগ করে সহজ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে। দেবদাসের খোঁজে চন্দ্রমুখী অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করেছে ; এমনকি পুণরায় মুখে রঙ মেখে, রঙ করা শাড়ি পড়ে 'নোংরা বেপাড়ায়' পতিতাবৃত্তির ভান করেছে, প্রাণান্তকর সেবায় তাকে সুস্থ করে তুলেছে। অবশেষে সমাজের দৃষ্টিতে তার অবস্থান ও মূল্য বুঝে নিয়েছে। তার ভাবনা লক্ষণীয় :

> আর যাহাই হোক, এ-জগতে তাহার সম্মান নাই। তাহার সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সম্মান পাইবে না। [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৭[ক] : ১৫৩-১৫৪]

পতিতা চাইলে তার ব্যবসা ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক সহজ জীবনে কখনোই ফিরে যেতে পারে না। সমাজ কখনোই তাকে সম্মানের চোখে দেখে না।

দেবদাসের আচরণ ও সংলাপে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের, সমাজপতিদের মনোভঙ্গিই প্রস্ফুটিত হয়। যখন সে বলে :

> আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব.... তবু আসব, তবু বসব, তবু কথা কব — না হলে যে উপায় নেই [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৭ক : ১৩২]

এই পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায়ই বাধ্য করে নারীকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে। পুরুষই তাকে ব্যবহার করে প্রয়োজনে। আর তার বিনিময়ে তাকে দেয় অভিশপ্ত ঘৃণিত জীবন। দেবদাস চন্দ্রমুখীর কাছে যায় তার হৃদয়ের 'জ্বালা নিবারণ' করতে। অথচ চন্দ্রমুখীর ভালবাসা নিবেদন তার কাছে 'থিয়েটার'-এর অভিনয়। অবশ্য একসময় দেবদাস চন্দ্রমুখীর সত্য ভালবাসা বুঝতে পারে। কিন্তু তাকে কোনো সম্মানজনক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ইচ্ছাও পোষণ করে না। অবলীলায় দাসীবৃত্তি করবার পরামর্শ দেয় তাকে। চন্দ্রমুখীর সেবাগ্রহণ করে সুস্থ হয়ে ওঠে দেবদাস, কিন্তু তার সঙ্গে চন্দ্রমুখীর পশ্চিমে যাওয়ার প্রস্তাবে বলে :

> ছিঃ, তা হয় না! আর যাই করি, এতবড় নির্লজ্জ হ'তে পারব না। [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৭ক : ১৫৩]

পশ্চিম প্রবাসে চন্দ্রমুখীকে তার কাছে পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে, পার্বতী জানতে পারলে লজ্জার আর অবধি থাকবে না, সম্মান বাঁচবে না। এখানে দেবদাস কোনো ব্যক্তি নয় আর, সমাজেরই অবিকৃত প্রতিনিধি।

চরিত্রহীন শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাসগুলোর একটি। শরৎচন্দ্র স্বয়ং এ গ্রন্থটি সম্পর্কে যতবার মুখ খুলেছেন, আর কোনো রচনা সম্পর্কে বোধকরি সেরূপ করেন নি। বর্মা থেকে লিখিত তাঁর পত্রাবলি পাঠ করলেই এ প্রসঙ্গে তথ্যাদি জানা যায়। তিনি *চরিত্রহীন*কে *'সায়েন্টিফিক সাইকো এণ্ড এথিক্যাল নভেল'* বলে আখ্যায়িত করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর পত্রাবলিতে যে রকম উদ্বিগ্নতার সঙ্গে উপন্যাসটির পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাতে এটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, তৎকালীন সাহিত্যাঙ্গন ও পাঠক সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। একাধিক ব্যক্তির নিকট লিখিত পত্রে তিনি *চরিত্রহীন* উপন্যাস প্রসঙ্গে

টলস্টয়ের *রেসারেকশন* উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন, যার কাহিনী গড়ে উঠেছে একজন সাধারণ বেশ্যার জীবনকে অবলম্বন করে।

শরৎচন্দ্র তাঁর *চরিত্রহীন* উপন্যাসে একজন মেসের ঝিকে নায়িকা করেছেন, সে সাধারণ্যে পতিতা হিসেবেই পরিচিতা। দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক অপবাদ থেকে প্রেমাস্পদকে রক্ষা করবার জন্য তার নিকট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার প্রয়াস-এই দুয়ের নিয়ত বিরোধের ফলে যে অসহণীয় হৃদয়যন্ত্রণা, তাই প্রকটিত হয়েছে সাবিত্রী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে বিধবা সাবিত্রী কুলত্যাগ করেছিল বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে, সংসারের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সংসার সে বাঁধতে পারে নি। প্রবঞ্চিত হয়ে আর ঘরেও ফিরে যেতে পারেনি। তাই দাসীবৃত্তিকেই গ্রহণ করেছে বেঁচে থাকবার উপায় হিসেবে।

সতীশকে সাবিত্রী ভালবেসেছে। কিন্তু তাকে ভালবাসার পরিণামে সতীশের কি দশা হবে তা সাবিত্রী খুব ভাল করেই জানে। সমাজ তাকে 'কুলটা' নাম দিয়েছে। এই অপবাদ অসত্য জানলেও, নিজেকে তা থেকে মুক্ত করতে পারবে না সে। তাই সতীশের সংসার ত্যাগ করে যেতে চায়। বাঁচাতে চায় তাকে অপবাদ থেকে। কিন্তু সতীশ এতে বাধা না দিয়ে মৌন হয়ে থাকাতে জ্বলে উঠে সাবিত্রী, ভালবাসার অমর্যাদা সইতে পারে না সে। নিজের অপবাদের কথা ভাবে না সাবিত্রী। কিন্তু সতীশের মনটাকে এখনও সে পবিত্র মনে করে। প্রেমিককে সে ব্যক্তিত্বে, আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে চায়। সাবিত্রী সতীশকে তার ঘর থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দিন দুই পর বাড়ি ফিরে যখন শোনে সতীশ তার অনুপস্থিতিতে বাড়ীতে মদ্যপান করে মাতাল হয়ে তার ঘরে শুয়ে আছে তখন :

> তাহার মনে হইতে লাগিল, যে তাহার প্রিয়তম আকস্মাৎ সে যেন তাহারি সুমুখে মরিয়া গেল, যাহাকে সে মাত্র দুইদিন পূর্বে কটুকথায় অপমান করিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে যখন এত সত্বর এত সহজে, তাহার সমস্ত আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া এমন হীন, এমন কদাকার হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার, তাহার আর কিছুই রহিল না। তাহার দুই চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু একফোঁটা জল আসিল না। তাহার সর্বস্ব, তাহার দেবতা, কল্পনার স্বর্গ, তাহার ভ্রষ্ট জীবনের ধ্রুবতারা, তাহার ইহকাল-পরকাল সমস্তই যেন এক মুহূর্তে ঐ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টরাশির মাঝখানে লুটাইয়া পড়িল [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ খ : ৪৬]।

সাবিত্রীর এই যন্ত্রণা, হতাশা ও দুঃখ বেশীক্ষণ থাকে না ; ক্ষণকাল পরেই তার প্রেমময় হৃদয় সতীশকে ক্ষমা করে দেয়। তাকে সেবা করে সুস্থ করে তুলবার জন্য পিপাসার্ত হয় এবং 'তাহাকে দেখিবার কথা কহিবার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া' উঠে। কিন্তু সতীশের নিকট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা চাই, সে সতীশেরই মঙ্গলের কারণেই। তাই, কাশী যাবার পূর্বরাত্রে সে সতীশের প্রতি তার ভালবাসার কথা অস্বীকার করে। বলে, সবই ছিল ছলানামাত্র। এই বক্তব্যে হয়তো সাবিত্রীর সামান্য অভিমান যুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল সতীশের জন্য মঙ্গলাকাঙক্ষা, সতীশের মনে নিজের সম্পর্কে ঘৃণা সঞ্চার করার উদ্দেশ্য, যাতে সতীশ তাকে ভুলতে পারে, তার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারে সহজে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় খানিকক্ষণ পরেই সাবিত্রীর দুরাবস্থায় সতীশের স্নেহ-করুণ আচরণে। সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে :

> ওগো, কেন তুমি এই পাপিষ্ঠাকে এত ভালবেসেছিলে ? এই যে শপথ করলে আমাকে ঘৃণা কর, এই কি ঘৃণা করা ? তোমাকে এই দুঃখ দেওয়া, এত মিথ্যা বলা, সবই তোমার স্নেহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ? কে আমাকে বলে দেবে কি করলে আমি তোমার ঘৃণা পাব ? [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ খ : ৯৪]।

একদিকে সতীশের প্রতি প্রবল প্রেমাকর্ষণ, অপরদিকে সূক্ষ্ম পাপবোধ, নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এবং সামাজিক অপবাদ ও অসম্মান থেকে সীতশকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা- এই দুই বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত বেদনাদীর্ণ হয়েছে সাবিত্রীর হৃদয়।

সতীশও সাবিত্রীকে ভালবেসেছিল। তার অভ্যন্তরের সামাজিকসত্তা ও ব্যক্তি সত্তার টানাপোড়েনে জর্জরিত হয়েছে সে। তার এক সত্তা সাবিত্রীকে পবিত্র আসনে বসিয়েছে, পতিতার কোনো কালিমা দেখতে পায়নি সাবিত্রীর মুখমণ্ডলে। আরেক সত্তা নিজের ভালবাসাকে 'নীচুতা' বলেই আখ্যায়িত করেছে, যত বেদনাই হোক এই নীচুতা ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেছে। কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেকে মুক্ত মনে করেছে। কিন্তু তার প্রেমিক সত্তা কেঁদে চলেছে নিরন্তর। সতীশের অভ্যন্তরের দুই বিরোধী সত্তার লড়াই স্পষ্টতর হয়েছে অন্তর্গত আত্মকথনের মধ্যে :

> সে আবার প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাকে যে আমি ভালবাসিয়াছি।
> উত্তর পাইল, কেন বাসিলে ? কেন জানিয়া বুঝিয়া পঙ্কের মধ্যে নামিলে ?

প্রশ্ন করিল, তা জানিনে। পদ্ম তুলিতে গেলেও ত পাঁক লাগে।

উত্তর পাইল, ওটা পুরাতন উপমা—কাজে লাগে না। মানুষ ঘরে আসিবার সময় পাঁক ধুইয়া পদ্ম লইয়া আসে। তোমার পদ্মই বা কি, আর ঐ পাঁক কোথায় ধুইয়াই বা ঘরে আসিতে?

প্রশ্ন করিল, না হয়, নাই ঘরে আসিতাম।

উত্তর পাইল, ছিঃ! ও মুখেও আনিও না। [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬[খ] : ৬৬]।

অবশেষে এক সময় সতীশ তার ভালবাসার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পেরেছে। এবং এও বলেছে যে, সাবিত্রী যদি নিজ থেকে তাকে ছেড়ে না যেত তাহলে সতীশ তাকে মাথায় করে রাখত। কিন্তু প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে সতীশ-সাবিত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সতীশের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল কি ? সতীশ সাবিত্রীকে কিসের আসনে বসাতে চেয়েছিল ? স্ত্রী, প্রেমিকা নাকি রক্ষিতার? এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে সতীশের গ্রামের বাড়ীতে অসুস্থ সতীশে সঙ্গে সাবিত্রীর কথোপকথন লক্ষ করতে হবে। তা এরকম :

সাবিত্রী .... বলিল,..... কিন্তু তুমিই বা আমাকে নিয়ে কি করবে শুনি ?

সতীশ মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যদি বলি বিয়ে করব!

সাবিত্রী বলিল, আর আমি যদি বলি আমার তাতে মত নেই?

সতীশ কহিল, তোমার মতামতে কিছুই আসে যায় ন [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬[খ] : ২১০]

এই মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে 'যদি বলি বিয়ে করব' বলা থেকে প্রমাণিত হয়, বিয়ের ব্যাপারে সতীশের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না ? আর এই আশ্চর্যবোধক চিহ্নই বা কেন ? তাহলে কি সতীশের মুখে বিয়ের কথা শুনে লেখকও আশ্চর্য হচ্ছেন? আসলে সতীশ স্বতন্ত্র কেউ নয়, সমাজেরই প্রতিনিধি। সমাজের বিধিনিষেধের গণ্ডী থেকে সেও মুক্ত করতে পারে না নিজেকে। সতীশ পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিনিধি বলেই, বিয়ের ব্যাপারে সাবিত্রীর মতামতের গুরুত্ব তার কাছে নেই ; এবং একথা সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

চরিত্রহীন উপন্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র কিরণময়ী। আপাতদৃষ্টিতে তাকে স্বৈরিণী বলেই মনে হতে পারে। সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, আজীবন বঞ্চনা এবং অপরিতৃপ্ত প্রেম-তৃষ্ণাই তাকে এরকম করে গড়ে তুলেছে। 'ছেলেবেলায় কিরণ

আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল।' স্বামী কিংবা শাশুড়ী কারোরই ভালবাসা পায়নি সে। স্বামী ছিল দার্শনিক গোছের– তাকে পড়িয়ে, তার সঙ্গে তত্ত্বালোচনাতেই পরিতৃপ্ত ছিল। আর শাশুড়ী ছিল স্বার্থপর তার নিকট থেকে শ্রম আদায় করেই খুশী ছিল। এমন কি কিরণময়ী স্বয়ং এই প্রীতিহীন অস্বাভাবিক সংসারে স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি। অথচ ভালবাসবার, ভালবাসা পাবার পিপাসা তার অভ্যন্তরেও ছিল আর দশটা নারীর মতই। কিন্তু তার স্বামী ছিল 'জন্ম-নীরস'। তাই সে ভালবাসার পিপাসা মেটাতে আঁকড়ে ধরেছিল অনঙ্গ ডাক্তারকে। কিরণময়ীর সেই অশান্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তারই সংলাপে। উপেন্দ্রকে সে বলেছিল :

> ... তবু ত সেই অনঙ্গ ডাক্তারকে তুমি চেন না। চিনলে বুঝতে পারতে, কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা আমার এই বুকের মাঝখানে জমাট বেঁধে ছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল। কি জানো ঠাকুর পো, যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ [খ] : ১২৩]।

অনঙ্গের সঙ্গে এই সম্পর্কের জন্য কিরণময়ীর পাপবোধও ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তাকে ত্যাগ করতে পারেনি । অনঙ্গ ডাক্তার স্বামীর চিকিৎসা এবং সংসারের অর্ধেক ভার নিয়েছিল। আর শাশুড়ীও তাকে প্ররোচিত করেছিল এ পথে।

উপেন্দ্র-সুরবালার দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী কিরণময়ীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে আরও প্রবল করে তোলে। কিন্তু তার অনুভূতিকে মাধুর্যেও ভরে দেয়। এবারে তার তৃষ্ণা জেগে ওঠে স্বামীকে কেন্দ্র করে। প্রাণপণ সেবার মধ্য দিয়ে স্বামীকে পেতে চায় সে। কিন্তু স্বামীকে পায়নি বলেই সে বিশ্বাস করে, কারণ তার বুক জুড়ে ছিল উপেন্দ্র।

স্বামীর নিকট মনস্ক অধ্যয়নে জীবন, জগত ও নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে কিরণময়ীর একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। তার মতে, কোনো ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। আরাকানে দিবাকরের কাছে পরকাল, আত্মা ও ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার এবং ইহকাল ও দেহকেই স্বীকৃতি দেয়াকে অভিমান ও অন্তর্জ্বালার ফলে অতিকথন বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু নরনারীর সম্পর্ককে কিরণময়ী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করে না। তার মতে, সৃষ্টি করবার ক্ষমতার

নামই রূপ-যৌবন আর সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই হল প্রেম। আরও স্পষ্ট ভাষায়, প্রেমের মূলে প্রবৃত্তিকে কিরণময়ী অস্বীকার করে না।

প্রেমাস্পদ উপেন্দ্রের অপমান সহ্য করতে পারেনি কিরণময়ী। তাই তার স্নেহের ধন দিবাকরকে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে উপেন্দ্রের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, আপন অন্তর্জ্বালা জুড়াতে চেয়েছিল। অবশ্য দিবাকরের প্রতি তার হৃদয় একেবারেই প্রলুব্ধ নয়, একথা জোর দিয়ে বলা শক্ত। তার মতে দিবাকর ও কিরণময়ী পালিয়ে গিয়ে যেহেতু কারো অধিকারে হাত দেয়নি, সেহেতু তারা কোনো অন্যায় করেনি। সামাজিক অনুশাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে মীমাংসা প্রত্যাশা করে কিরণময়ী। সমাজ সকল সময় অভ্রান্ত, ব্যক্তিই কেবল ভুল করতে পারে— একথা সে বিশ্বাস করে না। সমাজ যখন তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে তখন তাকে আঘাত করতেই হবে। এতে সমাজের মোহমুক্তি ঘটে। প্রেমের অবৈধতার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই : এটি সামাজিক সংস্কার মাত্র। কিন্তু দ্বিধা ঘোচেনি কিরণময়ীর। সেই দ্বিধা, সেই দ্বন্দ্ব কিরণময়ীর আতর্দ্বন্দ্ব। ভালবাসাকেই সে সবার চাইতে বড় মনে করেছে। যাকে (দিবাকরকে) ভালবাসে না, কোনদিন ভালবাসেনি, ভালবাসতে পারে না, তাকে নিয়ে ঘর করবার, তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করবার লজ্জা, ঘৃণা তাকে অনুক্ষণ ধিক্কার দিয়েছে, যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে।

গৃহদাহ উপন্যাসে সুরেশ নাস্তিক। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, ধর্মকর্মে আসক্তি নেই-ই। কিন্তু যে হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে, যে সমাজে বাস করে, তাকে রক্ষা করা কর্তব্য বলেই মনে করে। মহিমকে ব্রাহ্মকন্যা বিবাহ করা থেকে নিরস্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। স্ত্রীর যোগ্যতা সে বিচার করে 'বাটনা বাটা', 'কুটনা কোটা' এবং রোগশয্যায় স্বামী সেবার মাপকাঠিতে : এই সুরেশ অচলাকে দেখে স্থির থাকতে পারে নি। প্রেমাকাঙ্ক্ষার দুর্বার স্রোতে ভেসে গেছে তার নীতি, সমাজ, সংস্কার বিশ্বাস। অচলাকে সে বলেছে :

> —কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। এ কি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট ? বলতে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন্ জাত, কোন্ ধর্ম, কোন্ মতামত আছে, যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়েও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ [খ] : ২৪৮]।

কিন্তু তবু সুরেশ নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেছে, পারে নি। বন্ধু মহিম এবং বন্ধু-পত্নী অচলার অকল্যাণ কামনা করেছে, আবার নিজের এই নীচতার জন্য

নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। তবু ভালবাসার উত্তাপ তার কমেনি। একসময় হীন উপায়ে অচলাকে নিয়ে পালিয়েছে। যে সুরেশ মৃণালের সতীত্বের আদর্শকে শ্রেয়বলে মনে করে, সে সুরেশ অচলাকে নিয়েও পালিয়ে যায়। অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের এটাই প্রমাণ। কিন্তু সুরেশ নৈতিকভাবে কখনোই নিজেকে অপরাধী মনে করেনি। অচলার ভালবাসা না পেয়ে তার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। অবশেষে সুরেশ এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে যে, মন ছাড়া দেহের বোঝা অসহ্য ভারী।

অচলা মহিমকে ভালবেসেছিল যথার্থই। কিন্তু সুরেশের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিল। এর মূলে প্রেমাকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল ছিল তার স্নেহকরুণ হৃদয়। তার পিতার অর্থলিপ্সা অবশ্য এক সময় বাধ্য করেছিল তাকে সুরেশের দিকে চোখ ফেরাতে। অচলার হৃদয়ে সনাতনী হিন্দু আচারনিষ্ঠার আতিশয্যের সঙ্গে ব্রাহ্ম শিক্ষা-দীক্ষার একটা বিরোধ বেঁধেছে বটে মাঝে মাঝে। কিন্তু তার অভ্যন্তরে ভারতীয় নারীর সংস্কার নিতান্ত অনুপস্থিত ছিল না। মহিমের সঙ্গে বিবাহের পর অচলা সুরেশকে এড়িয়ে চলতে চায় এবং তার সঙ্গে সংসার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করাকেও পাপ মনে করে। অচলা বলেছিল, স্বামীকে সে ভালবাসেনা। কিন্তু এটা তীব্র অভিমান ও মানসিক যন্ত্রণার ফল, যার মূলে রয়েছে মহিমের সীমাহীন শীতলতা ও মৃণালের সঙ্গে তার কাল্পনিক সম্পর্ক।। আর এই উক্তির জন্য অচলার অনুশোচনারও শেষ নেই। স্বামীর অসুস্থাবস্থায় সুরেশের বাড়ীতে তার প্রতি নিজের সামান্য আকর্ষণ কল্পনা করে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু এই অচলার অভ্যন্তরে ছিল করুণার ফল্গুধারা, অসুস্থ সুরেশকে দেখে যা বেরিয়ে এসেছে। অচলা সুরেশকে তাদের সঙ্গে যাবার অনুরোধ করেছে। তবুও তার সনাতন বিশ্বাস সুরেশের সঙ্গে নিজের যাত্রাকে সমাজ, ধর্ম এবং নারীর সমস্ত গৌরব থেকে বিচ্যুতি বলেই মনে করে। অবশেষে অচলা মৃণালের সংস্কারকেই ধ্রুব বলে জেনেছে। স্বামীকেই জীবনে-মরণে ধর্ম ও সত্য বলে স্বীকার করেছে। স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করাকেই সতীত্ব বলে বিশ্বাস করেছে।

কেদারবাবু 'গড়-পরতা' ধরনের মানুষ। মৃণালের সতীত্বের আদর্শে অভিভূত হয়ে হিন্দুত্বে ফিরে আসবার কথা যেমন ভেবেছেন, আবার কন্যার যন্ত্রণার কথা কল্পনা করে তাঁকে ক্ষমা করবার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। উদার মহিম সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আবার গ্রহণ করবে অচলাকে -উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় এই ইংগিত দিয়ে যান শরৎচন্দ্র। রামবাবুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে সনাতন হিন্দু সমাজের আচার নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় সংস্কার তার মতো একজন স্নেহ-করুণ বৃদ্ধকেও হৃদয়হীণ পাষণ্ডে পরিণত করতে পারে, যে হৃদয়হীনতার কারণে রামবাবু একজন অসহায় নারীকে 'মৃত্যু-পুরী'তে ফেলে রেখে প্রায়শ্চিত্তের জন্য দৌড়াতে

দ্বিধা বোধ করেন না। এ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বহু পুরাতন প্রশ্ন নতুন করে উচ্চারিত হয়েছে মহিমের মাধ্যমে :

> ... এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধুলিসাৎ হইয়া গেল, যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম, এবং মানবজীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে ? [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬ খ : ৪০০]।

বামুনের মেয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে পল্লীগ্রামকে পটভূমি করে, কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে ও মুখোশে সামাজিক শোষণ যাকে ঘিরে রয়েছে। এখানে পড়াশুনার জন্য বিলেত গেলে জাত যায় : ব্রাহ্মণের কৃষিকর্মে জাত যায়। এখানে কন্যার জীবনের চেয়ে কুলরক্ষা বড়, তাই পাত্রের বয়স কন্যার তিন/চার গুণ হলেও লজ্জা বা মনস্তাপের কারণ নেই, রীতিও নেই। এ সমাজে ব্রাহ্মণেরও মধ্যে রয়েছে উঁচু-নীচু জাতবিচার।

বিলেত যাবার অপরাধে অরুণ একঘরে, তার জাত গেছে। জাত অবশ্য সে বাঁচাতে পারত, গোলক চাটুজ্যের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিলে, একথা গল্প থেকেই স্পষ্ট। কিন্তু সমাজের জন্য ভাবে না অরুণ, একে পরোয়াও করে না। সে আজ সন্ধ্যার কাছেও অস্পৃশ্য হয়ে গেছে, যাকে সে ভালবাসে। এই ব্যথাই অরুণের নিকট সবচাইতে বড়। সন্ধ্যার জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তই সন্ধ্যার নিকট বড় ব্যাপার নয়। অরুণের পথে সন্ধ্যার বিঘ্ন আরও গভীরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণের মধ্যে সবচাইতে নীচুতে অরুণের অবস্থান। কুলীন ব্রাহ্মণের বংশগৌরব সন্ধ্যার ভালবাসাকে অবদমিত করেছে, দলিত-মথিত করেছে। অরুণকে সন্ধ্যা বলেছে :

> বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমিত ভুলতে পারিনে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৭ ক : ৫১০]।

কিন্তু যখন প্রমাণিত হয়েছে সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের নয়, নাপিতের মেয়ে এবং কদাকার তার পিতার জন্মের বৃত্তান্ত, তখন অরুণের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। কিন্তু যে

জাত্যাভিমানের কারণে সন্ধ্যা একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে জাত্যাভিমানের চক্রাবর্তে বন্দী অরুণ নিজেও। তাই সন্ধ্যার আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে পারেনি সে। ভাবতে হয়েছে তাকে। অবশ্য অরুণ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল সমাজকে তুচ্ছ করে সন্ধ্যাকে স্থির গ্রহণ করবার জন্য সে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্য স্থির হয়েছে, সামাজিক বিধি-বন্ধন ত্যাগ করবার সাহস সঞ্চয় করেছে, 'মেয়ে মানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা.' তা জানতে পিতার সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

জাত বাঁচানোর ছদ্মাবরণে কুলীন ব্রাহ্মণের বহু বিবাহের 'ব্যবসায়ের' নিষ্ঠুরতার শিকার কালিতারা। আপন জীবনের লাঞ্ছনা-অপমানের দুঃসহ যন্ত্রণা-ভোগের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছেন, জাত-কুল এবং তার জন্য অভিমান, সকলই মিথ্যা, অর্থহীন। সত্য কেবল মানুষ এবং ভালবাসা। জাতের মিথ্যা গৌরবের আত্ম-প্রবঞ্চনার গ্লানি তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন, প্রতি মুহূর্তে তা থেকে মুক্তির জন্য আকুল হয়েছেন। উপায়হীন এই আকাঙ্ক্ষা তাকে অহোরাত্র পুড়িয়েছে ভেতরে ভেতরে। সংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞানদার হৃদয়েও সংসারের বাসনা জেগেছিল, আকাঙ্ক্ষা করেছিল সে ভালবাসা পাবার। পরিণামে মাথায় তুলে নিতে হয়েছে তাকে কলঙ্কের অপবাদ। শেষ ফল জেনেও জ্ঞানদা গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করতে চায়নি।

গোলক চাটুজ্যে কপট, হৃদয়হীন, প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিনিধি। প্রকাশ্যে আচার-নিষ্ঠার তার অন্ত নেই। কিন্তু গোপনে ছাগল-ভেড়া চালান দেয় বিলেতে, এমন কি গরু চালানের জন্য চড়া সুদে টাকা ধার দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। শ্যালিকা জ্ঞানদার সর্বনাশ করে নির্বিঘ্নে তাকে বিতাড়িত করে একটি বালিকাকে বিবাহ করতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছে পুরুষ-শাসিত সমাজের জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশী কৌলিন্য প্রথার জন্য।

পথের দাবী উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সব্যসাচী তার রাজনৈতিক বিপ্লবের সমান্তরাল বলে মনে করে সামাজিক বিপ্লবকে। বর্ণাশ্রম প্রথার কঠোর সমালোচক সে। তার চোখে সকল ধর্মই মিথ্যা, কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার পরম শত্রু। তাই যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস করে নতুনের প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায় সব্যসাচী।

সব্যসাচীর বিপ্লবী দল 'পথের দাবী'-র সদস্যগণ সমাজে নারীর সনাতন অবস্থানে বিশ্বাস করে না। সতীত্বের পুরানো ধারণায় তাদের আস্থা নেই। কেবলমাত্র মন্ত্রের বলে নারীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখবার সামাজিক অনুশাসন তারা ভেঙ্গে

ফেলতে চায়। স্বামীকে ভালবাসতে না পারলে তার সঙ্গে অবস্থান করা অসততারই পর্যায়ভুক্ত, তাদের নিকট, কেননা সতীত্ব কেবলমাত্র দেহের নয়, মনেরও ব্যাপার। অপূর্বর প্রতি সুমিত্রার সংলাপে *পথের দাবীর* নারী বিষয়ক চিন্তা ভাবনা প্রকাশিত হয় :

> যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্য্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন, কিন্তু এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-দেশে ও বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্বত শুধু দেহেই পর্য্যবসিত নয় অপূর্ববাবু, মনেরও ত দরকার? কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌছান যায় না? আপনি কি সত্যই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? এ কি পুকুরে জল যে যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?
>
> [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৭ খ : ৬৯]

পথের দাবীর সদস্যরা মানুষের প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে না। আর নারীর বাইরে আসাটাকেই চরিত্র কলুষিত হবার কারণ মনে করে না। নরনারীর সম্পর্কের জন্য দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সে দোষ বিধাতার, যে বিধাতা মানুষের মনে অনুরাগের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, এই তাদের বিশ্বাস।

সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুশাসনের সঙ্গে নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের বিরোধ বেঁধেছে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমোপাখ্যানের ভেতর দিয়েও। আচারনিষ্ঠ পরায়ণ অপূর্ব ও খ্রিষ্টান ভারতী পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছিল। কিন্তু অপূর্বর ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির কারণে তাদের ভালবাসা সার্থকতার কোনো পথ খুঁজে পায়নি। নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অবশেষে একদিন গোঁড়া অপূর্ব খ্রিষ্টান ভারতীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে।

শরৎচন্দ্র *শেষপ্রশ্ন* উপন্যাস প্রসঙ্গে রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন :

> অতি-আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত, ... এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ- ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় করে তোলবার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকী

রইলো। ... মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেলো-তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষপ্রশ্নে করেছি [গোপাল চন্দ্র রায় ১৯৮৬ : ৩০৫]।

এ রকম কথা শরৎচন্দ্র একাধিক ব্যক্তিকে লিখেছেন। বাস্তবিক, শরৎচন্দ্রের মনে আধুনিক যুগের সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উঁকি মেরেছে তাই তিনি উপস্থাপিত করেছেন *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসে। বলাবাহুল্য, এ উপন্যাসে গল্পাংশ (Story Element) খুবই কম ; শরৎচন্দ্র নিজেও একথা উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন ও মতবাদগুলো বেশির ভাগ সময় উত্থাপিত হয়েছে সংলাপ ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে। শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে *শেষপ্রশ্ন* একটি।

নায়িকা কমল উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দু। তার মাধ্যমেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি এবং অনুশাসন সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাশীল মানুষের যুক্তিনিষ্ঠ মতামত প্রকাশিত হয়েছে হিন্দু-সমাজের ধর্মের ছদ্মাবরণের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে যে অমানবিকতা, যে শোষণ, যে প্রবঞ্চনা, তা উত্থাপিত হয়েছে। নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসের অন্ধত্ব কেটে আধুনিক যুগের নতুন আলোর স্ফুরণ ঘটেছে। কমলকে বিদ্রোহিনী বললে ভুল হয় না। তার বিদ্রোহ কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। বরং তার বিদ্রোহ পুরো সমাজের বিরুদ্ধে, সমাজ পুরুষ-শাসিত, যে সমাজ নারীর অধিকারকে খর্ব করেছে নানান ছলনায়, যে সমাজ নারীর মানবসত্তাকে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত করে নানান নৈতিক অনুশাসনে। কমলের এই বিদ্রোহ আকস্মিক ঘটনানির্ভর কোনো সংঘাত নয়, নয় কোনো *ইজম*-সর্বস্ব আন্দোলনের আনুষ্ঠানিকতা বা *ফ্যাশন*। তার এই বিদ্রোহ সমস্ত জীবনে বিস্তৃত আর এর উৎসভূমি হচ্ছে জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট বোধ, নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে অকপট মত ও বিশ্বাস এবং ভারতীয় সমাজ বিষয়ে তার নিরাবেগ যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়ন।

কেবলমাত্র হাজার বছরের পুরাতন বলেই কমল ভারতীয় মুক্তবুদ্ধি দিয়ে এদের পরীক্ষা করে নেবার পক্ষপাতী এবং সে ক্ষেত্রে বড় মাপকাঠি হবে মানুষ ও তার কল্যাণ। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটানো বিধবার জীবনের পবিত্রতাকে কমল স্বীকার করে না। কারণ, সে জানে পুরুষ আপন স্বার্থে বিধবা নারীকে বিধবা করে রাখতে চায়। বিধবার পরের সংসারের গৃহিণীপনায়, পরের সন্তানের পুণ্যের জোর দেখিয়ে মহান করে তুলে, নানান চাটুবাক্যে তার কর্মভোগ করে আসছে। নারী সেই চাটুবাক্যে এমন মজেছে যে এই নিষ্ঠুর অস্বাভাবিক আত্মসংযমই তার নিকট স্বাভাবিক হয়ে গেছে, একেই সে পবিত্র বলে বিশ্বাস করেছে। কমলের ভাষায় :

... কর্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি, এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা।... শুধু মেয়েমানুষেই জানে এত বড় দুর্ভোগ, এত বড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়। [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬খ : ৪৬০]।

কমলের মতে, নরনারীর ভালবাসার ইতিহাসই হচ্ছে মানবসভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস। আর বিবাহটা জীবনের আর দশটা ঘটনার মত একটা ঘটনা মাত্র। বিবাহকে নারীজীবনের সর্বস্ব বলে বিশ্বাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। কমলের নিকট প্রেম আনন্দের বস্তু। সেই আনন্দকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করে তার স্বাভাবিকতা নষ্ট করতে চায় না সে। কেননা সে জানে, বিবাহে স্থায়িত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু দুটি হৃদয়ের মুক্তির পথ আবদ্ধ বলেই তাতে আনন্দ নেই। আছে শুধু ছলনা আর আত্মপ্রবঞ্চনা।

কমলের এই সকল বিশ্বাস কেবল মৌখিক আস্ফালন নয়। বরং সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েও সে তার বিশ্বাসকে প্রমাণ করেছে। কথায় ও কর্মে তার কোনো পার্থক্য নেই। শিবনাথের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল শৈবমতে। সকলে যখন তার এই বিবাহের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, সন্দেহ করেছে তখন সে ভেবেছে :

এ ভালই হ'ল যে, স্বামী বলে যাকে নিলুম তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক না। মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬খ : ৪৮৪]।

শিবনাথ সত্যি যখন তাকে ত্যাগ করেছে, কমল একটি মুহূর্তের জন্যও চেষ্টা করেনি তাকে ফিরে পাবার। অজিতকে কমল ভালবেসেছিল। অবশেষে তারা ঘর বাঁধতে চলে গেছে অমৃতসর। কিন্তু অজিতের বিবাহপ্রস্তাবেও সম্মত হয়নি কমল। এ ক্ষেত্রেও ভালবাসাকে আবদ্ধ না করে মুক্ত রাখতে চেয়েছে সে।

শিবনাথ মদ্যপ। মাতাল হবার অপরাধে চাকুরি যাবার সংবাদ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে তার লজ্জা নেই। প্রথম স্ত্রীকে সে ত্যাগ করেছে ব্যাধি, অকালবার্ধক্য ও কুশ্রিতার কারণে। কিন্তু এই ত্যাগের জন্য অন্য কোনো অজুহাত দাঁড় করায়নি সে।

সে দিক থেকে দেখলে কমলের সঙ্গে তার মতেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়, অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও।

শিবনাথ ও কমলের, বিশেষত কমলের সংস্পর্শে, প্রভাবে এবং তার সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে আগ্রাবাসী বাঙালিসমাজের সদস্যদের বিশ্বাসে, বোধে, এমনকি জীবন-যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অজিত কমলকে ভালবেসেও ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় পিছিয়ে এসেছে তার জন্ম ইতিহাস জেনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমলের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে সামাজিক বিধি-নিষেধের বাইরে গিয়েই। আশুবাবু তর্ক করলেও কমলের কথাই স্বীকার করে নেন। স্বীকার না করলেও তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন না। তিনি কমলের পিতাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না, কিন্তু এই য়্যুরোপীয়ের জন্য তার চোখে জল আসে। আশুবাবু শেষ পর্যন্ত শিবনাথের সঙ্গে মনোরমার বিবাহে সম্মত হন, সেও কমলের যুক্তির প্রভাবে। বিধবা নীলিমা, যার সংস্কারাচ্ছন্ন মন সেবাকেই কেবল আদর্শ বলে জানত, বৈধব্যে কমলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সমস্ত দুয়ার খুলে দিয়ে মুক্তবুদ্ধির আহ্বান করেছে। বৈধব্যের চিরাচরিত আত্মশাসন ত্যাগ করে নীলিমা আশুবাবুকে ভালবেসেছে। বৃদ্ধ, বাতগ্রস্ত আশুবাবু নীলিমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তার জন্য বেদনাও বোধ করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন তার ভালবাসার। নীলিমার ভালবাসাকে তিনি মিথ্যা বা ছলনা বলতে পারেন নি। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র তার আশ্রম তুলে দিয়েছে। তার মনে সন্দেহ জেগেছে আশ্রমের আত্মনিগ্রহের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বালকেরা দেশের কাজ করতে পারবে কিনা। এমন কি নীতিবাগিশ, কমলের কঠোর সমালোচক অক্ষয়ের মননেও শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে পরিবর্তনের সূক্ষ্ম রেখা । তার স্ত্রী রাঁধা-বাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে থাকে ; স্বামীই তার ইহকাল পরকালের দেবতা। অক্ষয়েরও এই আদর্শেই বিশ্বাস ছিল বরাবর। কিন্তু এখন নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে মাঝেমাঝেই।

শুভদা উপন্যাসে বিধবা ললনা শারদাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু সংস্কারের বশেই নিজেকে সংযত করেছে। দারিদ্র্যের চাপে একদিন আবার শারদার নিকট গিয়েছিল বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু শারদা তার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেনি। তারও অন্তরালে রয়েছে সমাজশাসন। অবশেষে দারিদ্র্যের চাপে পতিতাবৃত্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জমিদার সুরেন্দ্রনাথের আশ্রয় পেয়েছিল সে ঘটনাক্রমে। সুরেন্দ্রনাথ তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে তার অভ্যন্তরে পাপবোধ দানা বেধে উঠেছে। নিজেকে পতিতা ভাবতে শুরু করেছে সে। সুরেন্দ্রনাথকে ললনা বিবাহ করতে পারেনি; বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলে নয়, বরং পতিতাকে বিবাহ করতে নেই

বলে। সুরেন্দ্রনাথকে মালতি (ললনা) ভালবেসেছিল, আর তাই তাকে সমাজে হেয় করতে চায়নি।

শরৎচন্দ্র তার 'সমাজ-ধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের রীতি-নীতি এবং সনাতন অনুশাসনের সমালোচনা করেছেন। প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি বলেন :

> ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন কিজন্য ? সে কি শুধু আর একজনের লেখা শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্ত করিবার জন্য ? এবং একজন তাহার কি টীকা করিয়াছেন এবং আর একজন সে টীকার কি অর্থ করিয়াছেন- তাহাই বুঝিবার জন্য ? বুদ্ধির আর কি কোন স্বাধীন কাজ নেই? [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬[ক] : ৪১২]।

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সামাজিক ক্ষেত্রে পরম্পরাগত নির্বিরোধ অন্ধবিশ্বাস নির্বিচারে মেনে চলতে সম্মত নন। সামাজিক রীতি-নীতি বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি আবেগ-উচ্ছ্বাসকে প্রাধান্য দিতে চান না। এ ক্ষেত্রে তিনি মানুষের মুক্তবুদ্ধি নিরাসক্ত যুক্তি এবং সূক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতাকে আহ্বান করেছেন। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, শরৎচন্দ্র নিজে কি তাঁর সাহিত্যকর্মে সামাজিক সমস্যাবলী মীমাংসার ক্ষেত্রে সকল সময় যুক্তিনিষ্ঠ থাকতে পেরেছেন ? মুক্তবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করতে পেরেছেন ? নাকি কোনো সংস্কার তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে, কোনো আদর্শ তার যুক্তিকে খণ্ডিত করেছে ? 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ থেকে আমরা এ আলোচনা শুরু করেছিলাম, তা থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করতে পারি। বহু অধ্যয়ন ও পরিশ্রমে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে তথ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন নারীকে কেমন করে শোষণ করছে পুরুষ, কেমন করে তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। শরৎচন্দ্র নারীর এই শৃঙ্খল মুক্তির যুক্তিও দেখিয়েছেন। এবং শেষে বলেছেন :

> অবশ্য শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না—তাহাতে আমেরিকার মেয়েদের দশা ঘটে। তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হইয়াছে।... তাই কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬[খ] : ৫৯৫-৯৬]।

শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল যে সনাতন সামাজিক সংস্কার, তার শাসনেই তিনি নারীর পূর্ণ শৃঙ্খলমুক্তির কথা ভাবতে পারেন নি, প্রস্তাবও করেন নি।

কিন্তু কি করে অর্জিত হতে পারে সে মুক্তি ? নারী তার মূল্য পেতে পারে কি করে ? অনেক তত্ত্ব-তথ্যের পর শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেন :

> নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও ন্যায়-ধর্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন, বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এই সমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোর্ধ অর্থের সাহায্যে পারে না [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬খ : ৫৯৮]।

শরৎচন্দ্র নারীর মূল্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধর্মপুস্তকের খুঁটিনাটির ওপর যেমন নির্ভর করতে পারেননি, তেমনি যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারাও তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি পুরুষের দয়ার উদ্রেক করতে চেয়েছেন। নারীও পুরুষের মতই মানুষ- এই জন্য তার সঠিক মূল্যায়ন করা উচিত, তা নয়। বরং নারী দুর্বল- এই জন্য তাকে দয়া করা উচিত, এই তাঁর বক্তব্য। শরৎচন্দ্রের নিকটও 'পশু-ক্লেশ নিবারণী সমিতি' আর 'নারী রক্ষা সমিতি'তে কোনো তফাৎ রয়েছে বলে মনে হয় না। এই মনোভঙ্গি গড়ে ওঠে পুরুষশাসিত সমাজের যুগ-যুগ লালিত সংস্কার থেকেই। শরৎচন্দ্রের সংস্কারাচ্ছন্ন এবং সামাজিক-আদর্শবাদী মনের পরিচয় তাঁর গল্প-উপন্যাসেও সুলভ।

পণ্ডিত মশাই উপন্যাসে কুসুম স্বামী বৃন্দাবনের ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল শৈশবে। তারপর তার মা তাকে কণ্ঠীবদল করে বিয়ে দিয়েছিল এবং সেই স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। শরৎচন্দ্র কুসুমের মনে বৃন্দাবনের জন্য প্রেমাকর্ষণ সৃষ্টির পূর্বে তার মনে বৃন্দাবনকেই একমাত্র স্বামী বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কেবল কুসুমের জানাটাই যথেষ্ট নয় ; প্রকাশ্যে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে কুসুমের বাল্যকালের রহস্য। জানা গেছে, কণ্ঠীবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, আসলে তা হয়নি। কুসুম ফিরে গেছে বৃন্দাবনের বাড়ি। কিন্তু তা বিধবাবিবাহ নয়, স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়া।

চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র গড়ে তুলেছেন কিরণময়ীকে। কিন্তু তাঁর আজন্ম সংস্কারে এক সময় কিরণময়ীর আচরণ আঘাত করেছে। তাঁর সামাজিক-মন কিরণময়ীর কর্ম ও বিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারে নি। এর শাস্তিও শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তাকে। উপন্যাসের শেষে কিরণময়ীর পরিণতিতে পাঠক শিউরে ওঠে।। কিরণময়ী দিবাকরকে শুদ্ধতার সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়। তার আজন্ম-লালিত বিশ্বাসের ভূমি থেকে পতিত হয় সে। শরৎচন্দ্র তার কাছে থেকে ধর্মে অবিশ্বাস এবং

নাস্তিক্যের অহংকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভের আকাঙ্ক্ষায় মন্দিরে মন্দিরে করুণ ক্রন্দন ও উন্মত্ততা তার জীবনের অসারতা, ব্যর্থতা এবং দুঃসহ যন্ত্রণাকেই প্রকটিত করে। উপেন্দ্রকে সে ভালবেসেছিল। তার মৃত্যুশয্যায় মাথাটি কোলে নিয়ে বসবার অধিকার থেকেও কিরণময়ীকে বঞ্চিত করেন শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের রোহিনীর মৃত্যুকে Art-এর মৃত্যু বলেই অভিহিত করেছিলেন তিনি। *চরিত্রহীনে* কিরণময়ী নিহত হয়েছে Art সংস্কারাচ্ছন্ন শরৎমানসের দ্বারা।

শরৎচন্দ্র *চরিত্রহীন* উপন্যাসে উপেন্দ্র -সুরবালার দাম্পত্য প্রেমকে আদর্শ করে গড়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত সতীশ-সাবিত্রী কিরণময়ী-দিবাকর সকলেই উপেন্দ্রের আদর্শের নিকট নিজেদের সমর্পণ করেছে। শরৎচন্দ্র স্বয়ং উপেন্দ্রের প্রাণকে 'নিষ্পাপ বিরহ-জর্জর প্রাণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাবিত্রীকেও শেষ পর্যন্ত আদর্শবিধবা হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছে। উপেন্দ্রের প্রভাবে সাবিত্রী বৈধব্যের যন্ত্রণাকেই মাথায় তুলে নিয়েছে, সেবার আদর্শকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। পুরীতে উপেন্দ্র মোক্ষদার নিকট সাবিত্রীর পূর্বজীবনের কাহিনী জেনে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। শরৎচন্দ্র সুরবালার মৃত্যুতে উপেন্দ্রের মানসিক দুর্বলতাকেই তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা সত্য নয়। উপেন্দ্র তার আদর্শ থেকে এক চুল বিচ্যুত হয়নি। যখন সে জানতে পেরেছে, সাবিত্রী কুলীণ ব্রাহ্মণের কন্যা এবং তার সতীত্ব এখনও অক্ষুন্ন রয়েছে, কেবল তখনই সাবিত্রীর প্রতি সে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আদর্শ বিধবা হিসেবে গড়ে তুলেছে। শরৎচন্দ্র *চরিত্রহীন* প্রসঙ্গে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন :

> আমি উলঙ্গ বলিয়া আর্টকে ঘৃণা করিতে পারিব না, যাতে এটা 'ইন্ ট্রিক্টেষ্ট সেন্স মরাল' হয় তাই উপসংহার করব [গোপাল দত্ত রায় ১৯৮৬ : ২১]।

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, *আর্ট*-এর প্রতি পক্ষপাত থাকলেও, শরৎচন্দ্রের মনের গভীরে 'নীতি'র অনুশাসনও ছিল উপস্থিত। এই নৈতিক অনুশাসনই কিরণময়ীর শাস্তির বিধান দিয়েছে, সাবিত্রীকে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে প্রদান করেছে আদর্শ বিধবার আসন।

শরৎচন্দ্র *গৃহদাহ* উপন্যাসে অচলার আধুনিক মনের প্রেম-চাঞ্চল্য ও অস্থৈর্য রূপায়িত করেছেন। কিন্তু অচলার 'সমাজ-বিরোধী' প্রেমাকৃতি ও ক্রিয়া-কর্ম শরৎচন্দ্রের সামাজিক-মন বোধ করি সহ্য করতে পারেনি। তাই অচলাকে তার স্থান থেকে নামিয়ে আনবার নানান কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর তা করতে গিয়ে

উপন্যাসের এক অংশের ঘটনা সম্পর্কে অপর অংশে তথ্যগত বিচ্যুতিও ঘটিয়েছেন। ডিহরীতে সুরেশের নতুন বাড়ী দেখে অচলার মনে যে ভাবের উদয় হয়, শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে গেছেন অনেক পেছনে বিবাহের পূর্বে। বলেছেন :

> সেদিন তাহার (সুরেশের) সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬^{খ} : ৩৬৩]।

কিন্তু অচলার বিবাহ-পূর্ববর্তী ঘটনাবলী ও মানসিকতা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে না। পিতার অর্থলিপ্সায় বারবার লজ্জিত হয়েছে সে। শরৎচন্দ্র আরও বলেছেন :

> ... এই নিরালা শয্যার মধ্যে চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য জিনিসটাকে কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ-কথাতেও মন তাহার কোন মতেই সায় দিল না [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬^{খ} : ৩৬৩]।

অচলার এই মনোভঙ্গির জন্য শরৎচন্দ্র দায়ী করেছেন ব্রাহ্মসমাজকে, যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছে, অশন-বসনে যে সমাজে বিলাসিতাই হয়ে ওঠে উৎকট। শরৎচন্দ্র যে অচলার মানসিক বিবর্তন অঙ্কন করেছেন প্রেমের আদর্শে, সেই অচলারই শেষ পরিণতি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন অর্থ-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসনের প্রতি লিপ্সা দিয়ে। এবং এই সময় হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাকে তুলনা করতে ভোলেন নি তিনি। সনাতন হিন্দু ধর্মের কোনো আদর্শের সঙ্গে যে অচলার পরিচয় ঘটেনি, পরলোকের আশায় ইহলোকের মুখ বিসর্জন দেয়ায় নিষ্ঠা যে অচলা শেখেনি, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সনাতন হিন্দু সমাজে এমনটা হতে পারে, অচলার মত কাজ কেউ করতে পারে, একথা যেন শরৎচন্দ্র স্বীকার করতে চান না।

অচলার পাশাপাশি মৃণাল এ উপন্যাসে সনাতন হিন্দুত্বের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত। শরৎচন্দ্র তাকে আদর্শ নারী হিসেবেই দাঁড় করিয়েছেন। পতিব্রত্যে, ত্যাগে, সেবায় এবং বৈধব্যের নিষ্ঠায় তিনি মৃণালকে এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যে তাকে দেখলে মনে হয়, শরৎচন্দ্র যেন বলতে চান -'মৃণালকে দেখ, তাকে অনুকরণ কর।' উপন্যাসের উপসংহারে অচলা মৃণালের আদর্শকেই গ্রহণ করেছে, আত্মসমর্পন করেছেন সনাতন মূল্যবোধেরই নিকট। মহিমের হাত ধরে বলেছেন :

> আর আমি দুর্বল নয়, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল যেতে পারব [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬খ : ৩৯৮]।

নিরাশ্রয় অচলাকে শরৎচন্দ্র আশ্রয়ও দিয়েছেন সনাতন আদর্শ মৃণালের ছায়াতলে।

শেষ প্রশ্ন উপন্যাসে কমল সামাজিক-বিপ্লবের মন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সংস্কারাচ্ছন্ন মন ও সামাজিক আদর্শবাদের ক্ষীণধারা এ উপন্যাসের অভ্যন্তরেও প্রবাহিত। নীলিমা আশুবাবুকে ভালবেসেছে, একথা সত্য। কিন্তু সেই ভালবাসার স্বরূপ কি ? কি চায় সে ? নীলিমা আশুবাবুর নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে না। চায় শুধু তাকে একটু যত্ন করতে, তার নিঃসঙ্গ অসহায় বার্ধক্যে দুঃখকষ্টের বোঝা সেবা দিয়ে একটু লাঘব করতে। এখানেও আদর্শ। কমলের বিপরীত আদর্শ হিসেবে নীলিমাকে দাঁড় করানো হয়েছে। নীলিমা কমলকে সমর্থন করে ; কিন্তু নিজের আদর্শ দিয়ে, সেবা ও মাধুর্য দিয়ে তাকে অতিক্রম করে যেতে চায় যেন। অন্তত শরৎচন্দ্রের ঝোঁকটা সেই দিকেই। আশুবাবু কমলকে বলেন :

> কমল, তুমিই ওর (নীলিমার) আদর্শ,-কিন্তু চাঁদের আলো যেন সূর্যকিরণ ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্যে কতদিকেই না ছড়িয়ে দিলে [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৬খ : ৫৫৫]।

এমনকি যে কমল সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে সে নিজেও নারীর মুক্তির ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত। পুরুষের দয়া ও ত্রাণের ওপরই নারীর মুক্তি নির্ভর করে বলেই সে বিশ্বাস করে। তার ভাষায় :

> বিশ্বের এমনিই নিয়ম; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি, নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৯৬খ : ৫৪৪]।

যুক্তি নয়, নারীর নিরন্তর লড়াই নয়, কেবলই পুরুষের দয়ার ওপর নারীর মুক্তি নির্ভরশীল ? স্মর্তব্য, 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধেও শরৎচন্দ্র এই বক্তব্যই উপস্থাপন করেছিলেন।

নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে শিবনাথের নিজস্ব একটি মত রয়েছে। তার মত বা বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মের কোনো তফাৎ নেই। শিবনাথ মদ্যপ। মৃত বন্ধুর স্ত্রী-সন্তানকে পথে বসিয়ে তাদের অর্থ আত্মসাৎ করতে পারে সে। কমলের সঙ্গেও মিথ্যাচার করেছে। অসুস্থতার ভান করে আশুবাবুর করুণা লাভ করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্রের প্রায় সকল দোষই তার আছে। এককথায় তাকে দুর্বৃত্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে সন্দীপের রাজনৈতিক মতবাদ সমর্থন করতে পারেন নি বলে তাকে কদর্য করে অঙ্কন করেছেন—এরকম মত কোনো কোনো সমালোচক পোষণ করেন। শরৎচন্দ্র শিবনাথের সামাজিক মতবাদ নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে সমর্থন করতে পারেন না বলেই কি তাকে এমন দুর্বৃত্ত করে অঙ্কন করেছেন ? এ প্রশ্ন শেষ অব্দি একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

কেবলমাত্র *গৃহদাহ, চরিত্রহীন* কিংবা *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসেই নয়, বরং ভারতীয় আদর্শ নারীচরিত্র সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন শরৎচন্দ্র প্রায় সর্বত্র। *শ্রীকান্ত* (প্রথমপর্ব) উপন্যাসের অন্নদা আদর্শ সতীনারীর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীকান্তের নিকট তার আসন সীতাসাবিত্রীর সারিতে। অন্নদার প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি অস্পষ্ট নয়। শ্রীকান্ত সমস্ত জীবনে যত নারীর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, প্রায় সকলকেই সে অন্নদার সঙ্গে তুলনা করেছে, তার আদর্শে বিচার করেছে। অন্নদা স্বামীর ধর্মকেই নিজের ধর্ম, স্বামীর জাতকে নিজের জাত বলে জেনেছে। তাই সকল জেনেই সহোদরার হত্যাকারী স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছেন। সতীত্বের আদর্শকে বুকে ধারণ করে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে এলেও আত্মীয়স্বজন তাকে কুলত্যাগিণী বলেই জানে। তার এই সতীত্বের আদর্শ এখানে একটু বিচার নেয়া যেতে পারে। অন্নদা শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথকে দেয়া পত্রে লিখেছিন :

> শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি (স্বামী) আমার জন্যই করিয়াছিলেন কিন্তু সে মিছে কথা। তবু একদিন গভীর রাত্রে খিড়কির দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮৫ : ৩৪]।

অন্নদা যাকে বিশ্বাস করে না সেই স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। তার শত অত্যাচার সহ্য করেও সেবা করেছে দিনের পর দিন। আধুনিক মনন এর চেয়ে বড় 'অসতী' আর কাকে বলবে ? *শ্রীকান্ত* উপন্যাসেরই (চতুর্থ পর্ব) আরেকটি চরিত্র অভয়া যে পারস্পরিক প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন, ক্ষমতাহীন দাম্পত্যজীবনকে 'গণিকা'র জীবন বলেই আখ্যায়িত করেছিল। তবুও এই ভারতীয় সতীত্বের আদর্শ স্বৃজন

করেছেন শরৎচন্দ্র তার কথাসাহিত্যে একের পর এক। সতীত্বের আরেক উজ্জ্বল প্রতিমা *শুভদা* উপন্যাসের শুভদা চরিত্রহীন। স্বামীর সকল অত্যাচার সে সহ্য করে বিনা প্রতিবাদে। এমন কি স্বামীকে মনে মনে অপরাধী ভাবতেও পাপ বোধ করে। শুভদার সহনশীলতা ও পতিভক্তির আতিশয্য পুরাণ-কথিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে করে পতিতালয়ে পৌছে দেবার মত সতীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী, 'বোঝা' গল্পে নলিনী, 'বড়দিদি'তে মাধবী', *পণ্ডিতমশাই* উপন্যাসে কুসুম, *দেবদাস* উপন্যাসে পার্বতী- চরিত্র অঙ্কনে এবং আরো বহু স্থানে শরৎচন্দ্রের এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুতীক্ষ্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিতে সমাজে নারীর যথার্থ স্থানটি কত গ্লানিকর তিনি দেখেছেন এবং পাঠককে দেখিয়েছে। প্রচলিত ধর্মানুমোদিত আদর্শ, সতীত্ব, প্রভৃতি হিন্দুসমাজের মূল্যবোধগুলিকে, যেমন তাঁর উক্ত দুই প্রবন্ধে তেমনি গল্পে-উপন্যাসে, আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত করেছেন। কিন্তু তার পাত্রপাত্রীরা প্রায় কেউই (দু একটি মাত্র ব্যতিক্রম) বিদ্রোহ করে নি- মেনে নিয়েছে, দুঃখ পেয়েছে। নারীকে সনাতন অবস্থান থেকে বিচলিত করতে চাননি শরৎচন্দ্র। আমরা আগেই তা বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস বিশ্লেষণ করে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছে। তাঁর এই প্রবণতার উৎপত্তি সামাজিক আদর্শবাদ থেকেই।

শরৎচন্দ্র কখনো কখনো সমাজ-সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রসঙ্গ এনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কখনো আবার অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অস্বীকার করেছেন। 'পথ-নির্দেশ' গল্পে হেম গুণেন্দ্রর ভালবাসাকে অবহেলা করে এবং গুণেন্দ্রর প্রতি নিজের ভালবাসাকে অবদমন করে বৈধব্যের নিষ্ঠুর নিষ্ঠা নিয়ে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ী। অর্থ নিয়ে দেবরের দুর্ব্যবহার তার মনকে পুনরায় গুণেন্দ্রের দিকে ফেরায় আর তার এই প্রত্যাবর্তনকে ত্বরান্বিত করে গুণেন্দ্রর অসুস্থতার সংবাদে উদ্রিক্ত করুণা। প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেনি। 'অনুপমার প্রেম' গল্পে অনুপমা বৈধব্যের কঠোরতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিল, ভাই চন্দ্রবাবু পিতার উইল নকল করে (ইংগিত সে রকমই) তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে। এই দুর্দিনে অনুপমার মনে পড়ে ললিতমোহনের কথা, একদিন যে তাকে ভালবেসে লাঞ্ছনা মাথায় তুলে নিয়েছিল। তার মনে ললিতমোহনের ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। চন্দ্রবাবু তাকে পিতৃ-অর্থ থেকে বঞ্চিত করতে না পারলে বোধ করি তার মনে এই প্রেমাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠত না। *শুভদা* উপন্যাসে ললনা শারদার প্রতি নিজের ভালবাসাকে দমন করেছিল সামাজিক সংস্কার বলেই। একদিন অর্থনৈতিক চাপে সে শারদার নিকট পুনরায় গিয়েছিল তাকে বিয়ে করবার প্রার্থনা নিয়ে। এই তিনটি উদাহরণ থেকে সামাজিক-

আদর্শবাদী শরৎচন্দ্রকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হয় না। মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে , প্রবৃত্তিকে তিনি অস্বীকার করেছেন এখানে। অন্য কোনো কারণ ব্যতীত বাঙালি ঘরের বিধবা কেবলমাত্র তো প্রেমাকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাসে, প্রবৃত্তির তাড়নায় বৈধব্যের নিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিতে পারে- এ যেন শরৎচন্দ্র স্বীকার করতে চান না। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের এক স্থানে এরকম বক্তব্য তিনি উপস্থাপিত করেছেন।

শরৎচন্দ্র তার কথাসাহিত্যে পতিতার জীবন ও পরিবেশ নির্মাণ করেছেন, রঙিন করে। *শুভদা* উপন্যাসের কাত্যায়নী, *চরিত্রহীন* উপন্যাসের 'বাড়িওলী' ইত্যাদি দু একটি চরিত্রে পতিতার বঞ্চিত জীবনের ক্লেদ গ্লানি ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো গৌণ চরিত্র। শরৎ-সাহিত্যে মুখ্য পতিতার চরিত্রগুলো অঙ্কিত হয়েছে আদর্শায়িত করে। নারীর ত্যাগের, সেবা-পরায়ণতার যে সনাতন আদর্শ যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজে চলে আসছে, সেই আদর্শেই গড়ে উঠেছে এ সকল চরিত্র। শরৎ-সাহিত্যে পতিতা হয়ে উঠল সতী। অবশ্য পতিতাকে সতী করে অঙ্কন করায় শরৎচন্দ্রই প্রথম হাত দেন নি।। সংস্কৃত সাহিত্যে এর উদাহরণ রয়েছে। মুধুসূদনের হাতে বাংলা সাহিত্যে এ প্রবণতার সূচনা। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে মদনিকা এ পথের প্রথম পথিক। কিন্তু তবু মদনিকার সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে শরৎচন্দ্রের পতিতাদের। 'আঁধারে আলো' গল্পে পতিতা বিজলী সত্যেন্দ্রকে ভালবেসে বৃত্তি ছেড়েছে। সত্যেন্দ্রের স্ত্রী বিজলীর সঙ্গে যে আচরণ করে তা পাঠকের বাস্তব বুদ্ধিকে আঘাত করে। কোনো গৃহস্থ-গৃহিণী একজন পতিতার সঙ্গে এ আচরণ করতে পারে না, তাকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করতে পারে না। *দেবদাস* উপন্যাসে চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালবেসে পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করেছে, দেবদাসের সেবাদাসী হয়েই জীবন কাটাতে চেয়েছে। *চরিত্রহীন* উপন্যাসের সাবিত্রীর পরিণতিও ত্যাগে ও সেবায়। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী বৃত্তি ত্যাগ করে শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে শরৎচন্দ্র তার পতিতাদের মনকে সনাতন ভারতীয় সতীত্বের আদর্শে যাবতীয় কলুষকালিমা ও গ্লানি থেকে মুক্ত রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন। আবেগ দিয়ে তাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন। ফলে দরদী কথাশিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতা থেকে তার অঙ্কিত পতিতা চরিত্রগুলো অনেক দূরে অবস্থান করে। ব্যক্তিগতভাবে একজন পতিতার কিংবা বেশীর ভাগ পতিতার কাউকে ভালবাসা, তার নিকট নিজেকে সম্পর্ণ করা এবং সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভবও নয়। কিন্তু সে চাইলেই কি ফিরে আসতে পারে স্বাভাবিক জীবনে ? বেশীর ভাগ

ক্ষেত্রে, বলা চলে প্রায় সকল ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। সমাজব্যবস্থা তাকে ফিরে আসতে দেয় না কোনোদিনই। বাধ্য হয়ে তাকে যাপন করতে হয় বঞ্চিত জীবন। ছলনা ও চাতুর্যকেই চিরসঙ্গী করতে হয় জীবিকা অর্জনের জন্য। শরৎ-সাহিত্যে পতিতার সেই গ্লানিময় নিষ্ঠুর জীবনের ছলনা ও চাতুর্যের বাস্তবতা অনুপস্থিত।

শরৎচন্দ্র তার কথাসাহিত্যে সামাজিক সমস্যাবলী, নর-নারীর সম্পর্ক মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের অলক্ষ্য সামাজিক সংস্কার ও সনাতন নীতিবোধ যুক্তি-বুদ্ধিকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেছে। তার সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতাকে প্রায়শই খণ্ডিত করেছে সামাজিক আদর্শবাদ। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, পরিচিতি কিংবা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বাইরে সামাজিক মানুষেরর বোধ-বিশ্বাস-জীবনচর্চায় -এক কথায় মূল্যবোধে লুকিয়ে রয়েছে যে গভীরতর ও বৃহত্তর বাস্তবতা, শরৎচন্দ্র তাকে টেনে বের করে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু নিজের মনের বাস্তবতাকে,সংস্কারকে সনাতনের প্রতি মমতাকে লুকোতে পারেন নি। কোনো শিল্পী (কবি, সাহিত্যিক বা অন্য কোনো কলাকার) সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন না; তিনি কিছু সমস্যা, অসঙ্গতি তাঁর শিল্পকর্মে উপস্থাপন করেন এবং তার সমাধানের ইংগিত দিয়ে যান। শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে নর-নারীর সম্পর্ক ও তৎকালীন সমাজের আরও কিছু সমস্যার অমানবিক, অযৌক্তিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন এবং এ বিষয়ে বাঙালি সমাজকে ভাবিয়েছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি

গোপাল চন্দ্র রায় (সম্) ১৯৮৬ — *শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।* কলকাতা।

গোপীকানাথ রায় চৌধুরী ১৯৭৭ — "শরৎ-সাহিত্য ও সমসাময়িক কাল", *শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা* (সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্)। কলকাতা।

নীরেন্দ্রনাথ রায় ১৯৮৩ — "Palli Samaj : A Crititique", *সাহিত্য-বীক্ষা।* কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৩ — *রবীন্দ্র রচনাবলী,* অষ্টম খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩৮৫ *শরৎ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা।

১৩৮৬ক *শরৎ রচনাবলী*, তৃতীয় খন্ড। কলকাতা।

১৩৮৬খ *শরৎ রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা।

১৩৮৭ক *শরৎ রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা।

১৩৮৭খ *শরৎ রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা।